চাকদহ রামলাল একাডেমী

(উচ্চতর মাধ্যমিক)

চাকদহ, নদীয়া।

W.B.B.S.E. : Index No. D2-026 I W.B.C.H.S.E. : Index No. 112022 I H.S. Centre Code 4302
W.B.S.C.V.E. & T. Code No. : 6281 I DISE Code : 19102500903

স্থাপিত ঃ ১৯০৭

বার্ষিক পত্রিকা

৫২তম বর্ষ, ২০২১

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক ▸▸ দেবকুমার মণ্ডল
গোপাল মল্লিক

প্রকাশক ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক

প্রচ্ছদ ▸▸ ড. সৌমেন দে, গোপাল মল্লিক

মুদ্রণ ▸▸ চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
চাকদহ, নদীয়া।

প্রকাশনার তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২১

Dr. Mahua Das
PRESIDENT

WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER
SECONDARY EDUCATION

Vidyasagar Bhavan
9/2, Block-DJ, Sector - II
Salt Lake, Kolkata - 700 091
Phone : 2359-6526 (O)
9836655333 (M)
Tele Fax : (033) 2334 5541 (Office)

No. 2/PR/70/2024

Date 19/07/2024

To
The Headmaster
CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY
P.O. – Chakdaha, Dist. – Nadia,
PIN – 741222, West Bengal,

I am glad to know that **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY** is going to publish yearly Magazine containing various articles on the academic achievement of the institution.

I am aware that during this period the institute has rendered yeomen's service to the society since its inception and the institute also has produced many brilliant students under the proper guidance of the qualified teachers.

On the auspicious occasion I convey my sincere greetings and good wishes to the Teachers, Employees, Students, Members of the Managing Committee and those who are associated with this institution.

I also convey my best wishes for the success of the yearly Magazine **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY**.

Mahuadas

(Dr. Mahua Das)
President, WBCHSE

Office of the Assistant Inspector of Schools (SE)
Kalyani Sub Division
Suit No - 9, 2nd Floor, D.C. Building, Block- A
P.O. - Kalyani, Dist. - Nadia, PIN - 741235

Date – 23/07/2021

MESSAGE

I am glad to know that Chakdaha Ramlal Academy has decided to publish annual school magazine.

The school magazine is a platform for the students to express their creative pursuit which develops in them originality of thought and perception. The magazine also records achievements and various activities of the school. I hope that this publication will fulfil its objectives.

I extend my warm wishes to the Head Master, Staff and Students of Chakdaha Ramlal Academy to continue this journey.

Assistant Inspector of Schools (SE)
Kalyani Sub Division, Nadia

Government of West Bengal
OFFICE OF THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS (S.E.)
SOUTH 24 PARGANAS
NEW ADMINISTRATIVE BUILDING, 5TH FLOOR, KOLKATA: 700027

MESSAGE

I am very glad to know that Chakdaha Ramlal Academy, Chakdaha, Nadia, West Bengal, a century-old educational institution is going to publish its annual School Magazine.

'School Magazines' have a great educative value. It encourages students to think and write. In fact, young students find its first exposure through this medium. The magazine also reflects the achievements and other activities of the institution. It records the history of the institution, thereby recording the history of the community as well.

I hope that this publication would also be successful in achieving these objectives.

Pradyot Sarkar
District Inspector of Schools (S.E.)
South 24 Parganas

District Inspector of Schools (S.E.), South 24 Parganas

E-mail: dis.south24pgs@gmail.com ☎ 033-24790127 Arijit Basu

Prof. Dr. Kalyanmoy Ganguly
President

West Bengal Board of Secondary Education
Nivedita Bhawan, Karunamoyee
Block: DJ-8, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700 091

No : 34/Pres/21

Date : 22/07/2021

MESSAGE

I am happy to know that Chakdaha Ramlal Academy (H.S.) Nadia, is going to bring out its bilingual annual magazine shortly (both online and offline).

After successful completion of a long phase of committed effort to the cause of enlightenment of the local youths, the school appears to have become the centre of imparting quality education to the boys and girls on an equal footing.

It is really heartening to note that the school has been rendering service in spreading community learning, cultural understanding and well-being of underprivileged students.

There is no denying that Covid-19 has dramatically affected the normal way of living across the world including the conventional education system. But I strongly believe this time of uncertainty is short lived. Looking to a brighter future we pledge to keep education as top priority, of course with all safety norms.

I convey my best wishes to all students, respected teachers and all that are associated with the school. I wish them safety, good health and an all-round success in the publication of the souvenir.

Kalyanmoy Ganguly

(Kalyanmoy Ganguly)
President

The Headmaster,
Chakdaha Ramlal Academy,
P.O. Chakdaha, Dist. Nadia,
PIN - 741222

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		১৯
ঝড় বৃষ্টি	সায়ন সরকার	২০
গাছ	ভুবন সাহা	২০
উপলব্ধি	আদৃত রায়	২১
ইতিহাসের পাতায়	অনিক চৌধুরী	২১
বকুনি	অর্কদেব বোস	২২
শবদেহ	জয়দীপ সাহা	২২
সান্ত্বনা	অঞ্জন বিশ্বাস	২৩
ঘোড়ার বিবর্তন	পরিমল জোয়ার্দ্দার	২৪
ঘুম নাই	প্রিয়াঙ্কা অধিকারী	২৪
বড় অদ্ভুত এ জীবন	মেঘা মুখার্জী	২৫
প্রত্যয়ী	রাখী ভৌমিক	২৫
বিজ্ঞানমনস্ক বিদ্যাসাগর	বিপুল রঞ্জন সরকার	২৬
‘‘প্রকৃতি - মানুষ - পরিবেশ’’	অঞ্জয় কুমার শাসমল	৩৩
কল্প যাত্রা	সূর্য শেখর সুর	৩৪
ফেলুদাকে চিঠি	ঋতাদৃত মল্লিক	৩৬
মায়াবী যামিনী	রূপম শিকদার	৩৭
Genuine Eerie Incident	Priyam Ghosh	40
Amazing facts of the Earth (Animal / Country)	Sreeparna Nandi	42
Essay on Science and Technology	Shrijita Roy	44
X-পেরিমেন্ট	দেবাদিত্য রায়	৪৬
দার্জিলিং ভ্রমণ	শুভদীপ্ত রায়	৪৭
রহস্যময় মিশর	প্লাবন বিশ্বাস	৪৯
সেই সময় : আমার আত্মজ	আশিস বৈদ্য	৫০
Play: A Samaritan	Subir Kr Saha	51
Co-rider	Debkumar Mandal	57
সাত রাজার ধন মানিক	সাধন মণ্ডল	৫৯
WE	Taraknath Chanda	73
প্রধান শিক্ষকের লেখনীতে	ড. রিপণ পাল	৭৭
জাতীয় সেবা প্রকল্প — প্রতিবেদন	তুষার কান্তি পাল	৭৯

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ - ২০২১

১।	সভাপতি	ঃ	শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল
২।	সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
৩।	শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রীমতী সুচরিতা নাগ
৪।	শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রী রতন কুমার চৌধুরী
৫।	সদস্য (সরকারী আধিকারিক)	ঃ	এস.আই. অব স্কুলস্, চাকদহ আরবান সার্কেল
৬।	সদস্য (চিকিৎসক)	ঃ	বি. এম. ও. এইচ., চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
৭।	অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী বরুণ কুমার চক্রবর্তী
৮।	অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত
৯।	শিক্ষক প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার
		ঃ	শ্রী পরিতোষ উকিল
			শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী
১০।	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী সুনীল কুমার সরকার

কর্মচারী সংসদ (স্টাফ কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী তারকনাথ চন্দ

শিক্ষা সংসদ (একাডেমিক কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	মহঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা, শ্রীমতী পারমিতা পাল
		শ্রী আশীষ বৈদ্য

অর্থ উপসমিতি

সভাপতি	ঃ	শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল
সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

প্রধান শিক্ষক

১।	ডঃ রিপন পাল	-	এম.এসসি., বি.টি., পিএইচ.ডি.

সহকারী প্রধান শিক্ষক

২।	শ্রী সোমনাথ মজুমদার	-	এম.এসসি., বি.টি., সি.আই.টি.এ.

সহ শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ

৩।	শ্রী উজ্জ্বল কুমার উত্থাসনী	-	বি.এসসি., বি.পি.এড.
৪।	শ্রী শ্যামল কুমার দাস	-	এম.এসসি., বি.টি.
৫।	শ্রী শ্যামল কুমার বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.টি.
৬।	শ্রী দেবকুমার মণ্ডল	-	এম.এ., বি.টি.
৭।	শ্রী নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস	-	এম.এ. (ডবল), বি.টি., ডি.আই.টি.এ., এম.সি.এ.
৮।	শ্রী গোপালচন্দ্র তালুকদার	-	এম.এ., বি.এড.
৯।	শ্রী সুবীর কুমার সাহা	-	এম.এ., বি.এড.
১০।	শ্রী বিজন কুমার চক্রবর্ত্তী	-	এম.এ., বি.এড.
১১।	শ্রী তুষার কান্তি পাল	-	এম.কম., বি.টি., বি.লিব. এস.সি.
১২।	শ্রী রোহিত কুমার পাল	-	এম.এসসি., এম.এড., পি.জি. ডি.সি.এ
১৩।	শ্রী শিব প্রসাদ বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১৪।	শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১৫।	শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত	-	এম.এ., বি.এড.
১৬।	শ্রী নিশীথ মণ্ডল	-	বি.এসসি., এম.পি.এড.
১৭।	মহঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা	-	এম.এসসি., বি.এড.
১৮।	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড. [ইংরাজী মাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষক ও সহ প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত]
১৯।	শ্রী তারক নাথ চন্দ	-	বি.এ. (অনার্স), বি.এড.
২০।	শ্রী পরিতোষ উকিল	-	এম.এসসি., বি.এড.
২১।	শ্রী সমীর কুণ্ডু	-	এম.এ., বি.এড.
২২।	শ্রী কৌশিক দেবনাথ	-	এম.এ., বি.এড.
২৩।	শ্রী শম্ভুনাথ বসু	-	এম.এসসি., এম.বি.এ. ডি.আই.টি.এ., বি.এড.
২৪।	শ্রীমতী বৈশাখী ব্যানার্জী	-	এম.এ., বি.এড.
২৫।	শ্রী আনন্দ মণ্ডল	-	এম.এ., বি.এড.
২৬।	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড.

২৭।	শ্রীমতী পারমিতা পাল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৮।	শ্রী পরিতোষ মণ্ডল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৯।	শ্রী চন্দন ঘোষ	-	এম.এসসি., সি.সি.এইচ., এম.সি.আই.টি.এ., বি.এড.
৩০।	শ্রী চন্দন চক্রবর্ত্তী	-	এম.এসসি., এম.সি.এ., বি.এড.
৩১।	শ্রী গোপাল মল্লিক	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড.
৩২।	শ্রীমতী মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী	-	এম.কম., বি.এড.
৩৩।	শ্রী মিলন শর্মা	-	এম.এসসি., বি.এড.
৩৪।	শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার	-	বি.এসসি. (অনার্স), এম.সি.এ., বি.এড.
৩৫।	শ্রীমতী মৌমুক্তা দত্ত	-	এম.এসসি., বি.এড.
৩৬।	শ্রী পরিমল জোয়ারদার	-	এম.এসসি., বি.এড.
৩৭।	ড. সৌমেন দে	-	এম.এসসি., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
৩৮।	আশিস বৈদ্য	-	এম.এ., বি.এড., বি.এল.আই.এসসি.
৩৯।	সাধন মণ্ডল	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৪০।	অঞ্জন বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
৪১।	মৌমিতা দাস	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৪২।	শূন্যপদ		
৪৩।	শূন্যপদ		
৪৪।	শূন্যপদ		
৪৫।	শূন্যপদ		

পার্শ্ব শিক্ষক - শিক্ষিকা

১।	শ্রীমতী চন্দনা বিশ্বাস	-	এম.এ.
২।	শ্রীমতী মুক্তি বিশ্বাস	-	এম.এ.
৩।	শ্রীমতী নূপুর দাস পাল	-	এম.এ. বি.টি.
৪।	শ্রী উজ্জ্বল শীল	-	বি.এ. (অনার্স)

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষক - শিক্ষিকা

১।	শ্রী রবিউল মণ্ডল	-	(টেলিফোন ও মোবাইল সেট রিপেয়ারিং)
২।	শ্রী সুদীপ সরকার	-	ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ('ও' লেবেল ডোয়েক)
৩।	শ্রী পার্থ রায়	-	ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পি.ডি.সি.এ.
৪।	শ্রী শিবব্রত দাস রায়	-	এম.এসসি. এম.বি.এ.
৫।	শ্রী সঞ্জয় সূত্রধর	-	এম.এ.
৬।	শ্রী রণজিৎ মণ্ডল	-	এম.এসসি.

৭।	শ্রীমতী রাখী ভৌমিক	- এম.এ.
৮।	শ্রী সুশান্ত শর্মা	- এইচ.এস., আই.টি.আই. (কার্পেন্ট্রি)
৯।	শ্রীমতী মিঠু রায়	- এম.এসসি.
১০।	ডা. সানুজিৎ বসু	- বি.এসসি., ডি.এম.এস., ডিপ্.এন.আই.এইচ, সার্টিফিকেট ইন স্পোর্টস সায়েন্স।

গ্রন্থাগারিক

১। শূন্যপদ

সি.এল.টি.পি. ফ্যাকাল্টি

১।	শ্রী সুদীপ্ত দে	- বি.এসসি. ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন
২।	শ্রী সমীত মণ্ডল	- বি.এ.
৩।	শূন্যপদ	

করণিক

১।	শ্রী সুনীল কুমার সরকার	- বি.এ.
২।	শ্রী শুভায়ন দে	- এইচ. এস.
৩।	শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী	- বি.এসসি.

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১।	শ্রী কল্লোল পাল চৌধুরী	- বি.কম.
২।	শ্রী শুভ্র প্রকাশ সিংহরায়	- এম.এ.
৩।	শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জী	- অষ্টম উত্তীর্ণ
৪।	শূন্যপদ	
৫।	শূন্যপদ	

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষাকর্মী

১।	শ্রী শ্যামল চন্দ্র সেন	- অষ্টম উত্তীর্ণ

সাম্মানিক খণ্ডকালীন শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী

১।	শ্রীমতী সুলগ্না ব্যানার্জী	- বি.কম. (অনার্স), এম.বি.এ.
২।	শ্রীমতী গার্গী ঘোষ বর্ধন	- বি.এসসি. (অনার্স)
৩।	শ্রীমতী সায়ন্তি মণ্ডল	- বি.এসসি. (অনার্স)
৪।	শ্রীমতী মেঘা মুখার্জী	- বি.এ. (অনার্স)
৫।	শ্রীমতী সুপ্রভা দাস	- এম.এসসি. (ভূগোল)
৬।	শ্রীমতী সুস্মিতা বসু	- বি.এ. (হিন্দী)
৭।	শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস	- বি.এ.

পত্রিকা উপ–সমিতি

উপদেষ্টা মণ্ডলী	⏩	ড. রিপন পাল সোমনাথ মজুমদার শ্যামল কুমার দাস তুষার কান্তি পাল তারকনাথ চন্দ সুনীল কুমার সরকার
যুগ্ম সম্পাদক	⏩	দেবকুমার মণ্ডল গোপাল মল্লিক
সদস্য / সদস্যা	⏩	গোপাল চন্দ্র তালুকদার দীপ্তি দত্ত, প্রদীপ কুমার সরকার সমীর কুন্ডু, কৃষ্ণপদ সরকার সৌমেন দে, সাধন মণ্ডল অঞ্জন বিশ্বাস, নূপুর দাস পাল প্রিয়াংকা অধিকারী

স্মরণিকা

পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে আমরা এই অতিমহামারী সময়কালে দেশ-বিদেশের প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক, করোনা যোদ্ধা ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। এছাড়া সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

শোক বার্তা

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আনন্দময় মন্ডল ও সহ-শিক্ষক বিভাসরঞ্জন দাস এবং প্রাক্তন শিক্ষক শ্যাম সুন্দর কুন্ডু মহাশয়ের অকাল প্রয়াণ।

জন্ম ঃ ৪ অক্টোবর, ১৯৫৮ মৃত্যু ০৫ আগস্ট ২০২০

গভীর বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের সকলের পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, চাকদহ রামলাল একাডেমীর নবরূপকার, আনন্দময় মন্ডল মহাশয় অকস্মাৎ গত বছর করোনা অতিমহামারীর লকডাউন সময়কালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা সম্মিলিত হয়ে এক শোকসভার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠিত শোকসভায় শোকস্তব্ধ পরিবেশে শোকার্ত হৃদয়ে প্রয়াত আনন্দময় মন্ডলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সকলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভা তাঁর পরিবার পরিজনবর্গের প্রতি জানায় সমবেদনা ও সহানুভূতি।

আনন্দময় মন্ডল ছিলেন নিরলস কর্মানুরাগী। প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি ৬ জানুয়ারী, ২০১২ বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি চাকদহ পূর্বাচল বিদ্যাপীঠের (উঃমাঃ) সহ শিক্ষকরূপে ২৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। মাত্র ছ'বছরের বেশি কিছু সময় কালে তিনি চাকদহ রামলাল একাডেমীর আমূল সংস্কার সাধন করেন। এগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুক্তধারা নির্মাণ, পুরাতন ভবনের পুনর্গঠন ও নবনির্মাণ, বিদ্যালয়ের পুরাতন গ্রন্থাবলীর সংস্কার ও সংরক্ষণ, নতুনভবনের খেলার মাঠ সংস্কার, সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ, সুইমিং পয়েন্ট নির্মাণ, ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ, নতুন স্টাফরুম নির্মাণ, পুরাতন ভবনে নতুন তোরণ নির্মাণ প্রভৃত

উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন উদ্যোগী এবং কর্মবীর। ছুটির দিনগুলিতেও তিনি বিদ্যালয়ে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁর বিভিন্ন কর্মধারা অব্যহত রেখেছিলেন। তিনি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরাজী এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনীতি বিষয়ে পাঠদান করতেন। আজকের ইংরাজী মাধ্যমে পঠনপাঠনের নতুন বিভাগের স্বীকৃতির মূলেও ছিলেন তিনি। তাঁর সময়কালে বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবী করে।

সহ-শিক্ষক বিভাস রঞ্জন দাস

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী, ১৯৬৩ মৃত্যু ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

গভীর বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিভাস রঞ্জন দাস মহাশয় গত বছরের শেষ দিন কর্মরত অবস্থায় মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে এক শোকসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় শোকস্তব্ধ পরিবেশে শোকার্ত হৃদয়ে প্রয়াত বিভাস রঞ্জন দাস মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সকলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনবর্গের প্রতি জানায় সমবেদনা এবং সহানুভূতি। বিভাস রঞ্জন দাস ১১ জুলাই ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি বিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেছেন।

প্রাক্তন শিক্ষক শ্যাম সুন্দর কুন্ডু

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্যাম সুন্দর কুণ্ডু মহাশয় ৭ মে, ২০২১ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ১৯৬৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সুনামের সাথে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা লকডাউন থাকার কারণে ভার্চুয়ালি একটি শোকসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় সকলে প্রয়াত শ্যাম সুন্দর কুন্ডু মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন বর্গের প্রতি জানায় সমবেদনা এবং সহানুভূতি।

স্মারক বৃত্তি

১। **শশিভূষণ তারকদাসী স্মারকবৃত্তি ঃ** ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে সমভাবে আর্থিক এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২। **১৯৫৮ সালের পরীক্ষার্থী, প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত, ৭,০০০ টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নবম দশম শ্রেণীর নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে এককালীন বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

৩। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদ সমভাবে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৪। **প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী শংকর নাথ সরখেল দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০ হাজার টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের সমভাবে বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৫। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫০,৫০১ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে বাণিজ্য বিভাগের উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদত্ত বৃত্তি।

৬। **রাধিকা মোহন কর স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

৭। **পণ্ডিত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৮। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৯। **১৯৫৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫৭,০০০ (সাতান্ন হাজার) টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পুস্তক ক্রয় / শিক্ষোপকরণ ক্রয় / বার্ষিক পরীক্ষার ফি ইত্যাদি আর্থিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১০। **আয়ন্তী সরকার স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১৭,০০০ (সতের হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত গরীব ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১। **শান্তি সরকার স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা মাসিক ১০০০ টাকা বৃত্তি হিসাবে উ. মা. পাঠরত দুজন নির্বাচিত প্রকৃত গরীব ছাত্র/ছাত্রীকে দেওয়া হবে।

১২। **মধুসূদন মণ্ডল স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত প্রকৃত দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১৩। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিষ্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৪। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

সম্পাদকদ্বয়ের কলমে

বর্তমান সময়ে আমরা এক অতি অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছি। সকালে ঘুম ভাঙছে Ambulance- হুটারের শব্দে আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয় ambulance না হয় শবযাত্রার শব্দ। কোভিড ভাইরাসের ভয়ানক মারণ খেলা সমগ্র বিশ্বের মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাকে দাঁড় করিয়েছে এক সুবিশাল প্রশ্নচিহ্নের সামনে। কিন্তু মানুষ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিতে বিজ্ঞানের চাকায় ভর করে বিশ্বের আপামর বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকদের নিরন্তর সহায়তায় আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে এই অতিমারীকে করায়ত্ব করতে। স্থান-কাল নির্বিশেষে সারা বিশ্বব্যাপী সকলেই আজ এই অতিমারী পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে সচেষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্যতম ছাত্রসমাজ। ক্ষতিগ্রস্ত তাদের শৈশবের উচ্ছলতা, বাল্যের মাধুর্য, কৈশোরের আবেগ। তারই স্বল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা আমাদের এই দ্বিভাষিক বিদ্যালয় পত্রিকা **'বার্ষিক পত্রিকা-২০২১'**।

এই অতিমারীর করাল ভ্রুকুটির মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, মাধুর্য, আনন্দ, আশঙ্কা, উচ্ছলতা, আশা, ভরসা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা নানান প্রতিকূলতার সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকার ২০২১ সনের সংস্করণটি ই-ম্যাগাজিন ও ছাপাই-ম্যাগাজিন (hard-copy and soft-copy) — এই দুই আঙ্গিকেই প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছি। আসলে বিদ্যালয় পত্রিকার পৃষ্ঠাইতো ভাবিসাহিত্যিকদের আঁতুরঘর। প্রজাপতির মতো পাখা মেলতে শেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের সাহিত্যিকরা। এই সব কচি-কাঁচা সাহিত্যিকদের জন্য রইল আগাম শুভেচ্ছা। আমাদের এই প্রয়াসকে সার্থক করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সহ সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত সকল শিক্ষানুরাগী যেভাবে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের ছোট করবনা, বরঞ্চ অনুরোধ করব ভবিষ্যতেও তাঁরা যেন এইভাবে সর্বদা বিদ্যালয়ের পাশে থাকেন।

পরিশেষে এই অতিমারীকালে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

যুগ্মসম্পাদক,
পত্রিকা উপসমিতি
চাকদহ রামলাল একাডেমী।

ঝড় বৃষ্টি

সায়ন সরকার

পঞ্চম শ্রেণি, বিভাগ - গ

একা আমি বসে আছি
জানালার পাশে,
এ সময়ে আপন জন
কেউ যদি আসে।
হঠাৎ চমকে উঠি
শুনে মেঘের ডাক,
এলো কালবৈশাখী —
তাই বেজে ওঠে শাঁখ।
ঝড় থেকে শুরু হল
রিমি ঝিমি বৃষ্টি,
গরমের দাপট কমে
শীতের হল সৃষ্টি।

ফলে ফলাফল

কৌশিক কুণ্ডু

(একাদশ শ্রেণি)

আম খেলে ঘুম হয়
জাম খেলে রক্ত,
আখ খেলে দাঁত বুঝি
হয় বড়ো শক্ত।
অসুখেতে আনারস
পেটে সহে বেল,
পাকা কলা আর লিচু
কী যে করে খেল।
পেয়ারাটা চেহারাটা
করে ঝিকিমিকি,
বিধি মেনে ফল খেলে
বলে দেবে ঠিকই।

গাছ

ভুবন সাহা

(ষষ্ঠ শ্রেণি, বিভাগ - ঘ, রোল - ২০)

আমি বিশ্বভুবন সৃষ্টিতে প্রথম প্রাণ,
রেখেছি সর্বকালে প্রাণের অস্তিত্বের মান।
কালের বিবর্তনে হয়েছি নানা জাতি,
প্রাণীকুলের রক্ষায় ধরেছি মাথায় ছাতি
নিজের শাখায় স্থান দিয়েছি কত প্রাণ
তাইতো তারা ছুটে আসে নিতে আনন্দের আঘ্রাণ
সর্বক্ষণ দিয়েছি ফুল ফল ও স্নিগ্ধছায়া
অবশেষে এল বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-মায়া
সঞ্চয় যা করেছি সহস্র বর্ষ ধরে —
আপন স্বার্থে ধ্বংস করেছে মোদের ধীরে ধীরে
বিপন্ন করে প্রকৃতি ওরা করে সভ্যতার দাবি
এই ধ্বংসের স্বাক্ষী কেবল চন্দ্র তারা রবি।
বিধাতার কাছে প্রার্থনা এদের সুমতি দাও
মোদের দিয়েই তুমি এবার সভ্যতা বাঁচাও।

উপলব্ধি

আদৃত রায়

(সপ্তম শ্রেণি, বিভাগ - ক, রোল - ১)

‘মানুষের মতো মানুষ হতে হবে, হতে হবে ডাক্তার,’
একথাগুলোতো ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি বারবার।
‘কিংবা ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারো, নেই তাতে অসুবিধা
তবে অর্থ যে উপার্জন করতেই হবে নেই তাতে কোনো
দ্বিধা।’
ছোটোবেলার কিছু স্মৃতি আজও মনে পড়ে,
সেইগুলির কথা ভাবতেই চোখ দিয়ে জল ঝরে।
কোনো ভিখারিকে অল্প টাকায় একটু খাবার কিনেই দিলে
চোখ পাকিয়ে বাবা বকতেন, ‘‘পয়সা কী গাছে ফলে?’’
সেই দিনগুলি যদি আমি আবার ফিরে পেতাম,
তবে শুধুই ঘরে আবদ্ধ না থেকে জগতকে চিনতাম।

আজ কত শত অর্থ উপার্জন করি তার হিসাব নাই,
তবুও প্রকৃত সঙ্গীর অভাবে সবই মনে হয় যেন ছাই।
কিন্তু যেদিন চলে গেছে ফিরে আসবে না সে-তো,
আজ বুঝতে পারছি ভাগ না করে খেলে সব খাবারই
তেঁতো।

ইতিহাসের পাতায়

অনিক চৌধুরী

(দ্বাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান বিভাগ, রোল - ৬৩)

প্রথম প্রেমের অলস সায়াহ্ন
আবার প্রিয়তমার অনুষঙ্গ ছুঁছে,
সময়ের দূরত্বে বেঁচে থাকার অবিচল বিশ্বাসে,
স্তব্ধতাকে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায়,
হৃদয় বসন্তের কল্পনায় বাধা কোথায়?
শূন্যতায় হাজার প্রশ্ন-ভিড়
প্রেমের অদৃশ্য ঢেউ আশাবাদী মন
সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা, ইতিহাসের সাক্ষীর
স্বরূপ, ভরা সুখের ডায়েরি।
ইতিহাসের দিনগুলোতে খোলা মাঠের পূর্ণিমা
সময়ের সাথে সাথে আজ
কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িত বিলম্বিত চন্দ্রমাতে রূপান্তরিত।
অতীত স্মৃতিতে ইতিহাস হয়ে যায়
একান্তই নিজেকে ফিরে দেখার ধ্রুপদী খেয়াল ...
অবলীলায় এসে পড়ছি হলুদ নিরালয়
তবু চোখের সামনে ইতিহাসের ভবিষ্যৎ
জীবনখাতায় ভুলের অংক বারবার .....
যন্ত্রণায় আগলে রেখেছে ইচ্ছেনদীর ভাস্কর্য।
হয়তো এই স্মৃতি নিয়ে আরো কিছুকাল .....

‘‘বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। বিদ্যা আবরণে আর শিক্ষা আচরণে।’’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বকুনি

অর্কদেব বোস

অষ্টম শ্রেণি, বিভাগ - ক

মা বকে, বাবা বকে
কেউ তো আর বাকি নেই —
কিসের দরুণ বকুনি খাই
তা তো বোঝার ক্ষমতা নেই?

কেউ কি খুলে বলতে পারে
নিজের মনের কষ্টটুকু?
তাইতো আমি লিখছি খাতায়
হৃদয়ের সব ইচ্ছাটুকু।

পড়ার দরুণ বকুনি খায় না
কেউ কি এমন হতে পারে?
বিকেল বেলা খেলব না ভাই
কেউ কি তা সইতে পারে?

বড়রা কি কেউ বুঝতে পারে
তোমার আমার মনের ব্যাথা?
মনের দুঃখে ফেলতাম লিখে
ছোটোদের এই দুঃখ গাথা।

শবদেহ

জয়দীপ সাহা

দশম শ্রেণি

তোমার শরীর একদিন হবে শবদেহ
এ আবরণ শুধু অলীক মোহ।
হয়তো তোমার অন্তরাত্মা হবে মুক্ত
তবে, প্রকৃতি ঘোষণা করবে তোমায় মৃত।

দিনের আলোর মাঝে উপস্থিত হবে আঁধার,
সময় চলে আসবে দেহত্যাগ করার।
হাত হবে অবশ, শরীর হবে শীতল,
অবশেষে শুধুই র'বে কিছু পোড়াকাঠ।

অসংখ্য সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলি করবে আলিঙ্গন,
চোখের সামনে র'বে নীলাম্বর, স্তব্ধ হবে হৃদস্পন্দন।
শেষ মুহূর্তে কেউ জানবে না মনের প্রাপ্তি ও ক্রন্দন
অবশেষে হবে একেলা, শেষ হবে এক জীবন।

তোমার শরীর একদিন হবে শবদেহ
এ আবরণ শুধু অলীক মোহ।
হয়তো র'বে দুঃখ, কিন্তু থাকবে পরম আনন্দ
তুমি মৃত হয়েও হবে আবার জীবন্ত।

সান্ত্বনা

অঞ্জন বিশ্বাস

(শিক্ষক)

মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস
আলোক ঝরনাতলে
রেশমি চুলের আলগা লহর
হাওয়ার সাথে দোলে।

মুক্ত-স্বাধীন বলাকামালায়
গ্রন্থি পুষ্প মালা
গোধূলি বেলায় স্বপ্ন ভেলায়
সাজিয়ে অর্ঘ্য ডালা।

সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায়
সন্ধ্যামালতী ফোটে
আলতা রাঙায় শিরিন মেয়ের
সঙ্গী-সাথীরা জোটে।

নাকচাবি আর ঝুমকোলতায়
হলুদরঙা বাহার
কুসুম মালায় পরছে গলায়
কেউবা চন্দ্রহার।

কেউবা সেথায় টোপর মাথায়
কেউবা কনের সাজে
ঘোমটা মাথায় ছাদনাতলায়
মত্ত বিয়ের কাজে।

চম্পা-চামেলি বিনুনি-খোপায়
মাধবীমালায় গলে
হোক না যতই মিথ্যা সে বিয়ে
সাজছে সদলবলে।

খেলতে খেলতে হুশ নাহি রয়
গড়িয়ে সাঁঝেরবেলা
আঁধার ঘনিয়ে শেষ তবে হয়
নকল বিয়ের খেলা।

কত খুশি আর হাসিভরা মন
সেই যে সাঁঝের বেলা
জীবন জোয়ারে হারিয়ে গিয়েছে
বালিকাবেলার খেলা।

সান্ত্বনা দিয়ে মনকে বোঝাই
নাইবা পেলাম পিছু
লুকিয়ে সে দিন মনের ভেতর
হারাইনি সব কিছু।

মনটাকে তাই সজীব রেখেছি
মেঘবালিকার তরে
আগামীকে সেই গল্প শোনাতে
আকুলতা প্রাণভ'রে।

ঘোড়ার বিবর্তন

পরিমল জোয়ার্দ্দার
(শিক্ষক)

ইওসিনে আদি ঘোড়া ইওহিপ্পাস।
৩০ সেমিতে, শেয়ালের মত জাষ্ট।
সামনের পদে চার, পেছনে কার্যকরী আঙুল তিন।
নরম সবজি খেত, দাঁত ছিল যে পেষকহীন।
অলিগোতে মেসো হল ৬০ সেমি তে।
ভেড়ার ন্যায় তবে, আগুপিছু তিন আঙ্গুলেতে।
মেরি এল মায়োসিনে, টাট্টু হয়ে।
১০০ সেমি উচ্চতায়, নব খুর নিয়ে।
প্লায়ো এল, যুগের নামে প্রায় আধুনিক।
১২০ সেমিতে সে দীর্ঘ ক্রাউনিক।
প্লিস্টোতে ইকুয়াস দ্রুত গতির।
আঙুল হ্রাস পেয়ে, খুর হল উন্নত প্রকৃতির।

ঘুম নাই

প্রিয়াঙ্কা অধিকারী
(করণিক)

আরেকটা দিন, আরেকটা রাত চলে যায় .....
পৃথিবী আজ নিদ্রাহীন।
অদৃশ্য 'কাল' বুঝি আগামীকে হানা দেয় .....
তাই, শিক্ষা যেন স্বপ্নহীন।

এই যদি ছোঁয়া লাগে, যায় দূরে সরে সরে .....
জ্ঞানের শির হয় অবনত।
ভীতিকর পরিবেশে, ভিত বড় নড়বড়ে .....
তবু, জীবন-পরীক্ষা অবিরত।

'সবুরে মেওয়া ফলে', আশায় বাঁচে চাষা' .....
প্রবাদে সত্যি হয় তাই।
কতটা অপেক্ষায়, কতই বা জেগে থাকা?
পৃথিবীর যে আর ঘুম নাই!!

শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের এতটাই পার্থক্য,
যতটা জীবিতের সঙ্গে মৃতের।

—*অ্যারিস্টটল*

বড় অদ্ভুত এ জীবন

মেঘা মুখার্জী
(সান্মানিক খণ্ডকালীন শিক্ষিকা)

পাওয়ার মাঝে না পাওয়া ও না পাওয়ার মধ্যে সব
খুঁজে পাওয়া
সাফল্য ও ব্যর্থতার নিত্য আনাগোনা
তারই মাঝে জীবনরস লুটেপুটে নিংড়ে নেওয়া।

কত কথায় মাঝে কিছু না বলা
কিংবা নীরব বাক্যে সবটুকু বলে দেওয়া।

মান অভিমানের পাহাড় নিত্য ভাঙে গড়ে
সুরের মূর্ছনায় যেন তারই প্রকাশ ঘটে।

শত প্রতিকূলতায় কাউকে পাশে পাওয়া
কিংবা একাকীত্ব নামক আগুনের তীব্র দহন জ্বালা।

হিংসা রেষারেষি - নোংরা পলিটিক্সে
সর্বসাধারণের নাজেহাল হওয়া।

মানুষরূপী পশুর সংখ্যা
ক্রমশই বেড়ে যাওয়া।

শুধু শান্তি আছে প্রকৃতির মাঝে,
আছে শুধুই মায়ের আচঁলের গন্ধে।

প্রত্যয়ী

রাখী ভৌমিক
(ভোকেশনাল শিক্ষিকা)

আঘাত সয়েছি বলে ভেবো না
প্রত্যাঘাত তুমি পাবে না।
ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়
এটাও কী তুমি জানোনা।

কালসমুদ্রে তুমিও যাবে ভেসে
শুষ্ক তৃণ আস্তাকুরের মত।
রাজপুত্র যতই তুমি হও
সঙ্গে তখন কেউ রবে না হয়ত।

হয়ত তুমি অমিত শক্তিধর
সুখ্যাতিও হয়ত নীপবনে,
বেলাশেষে দেখবে তুমি একা
সবাই তখন অন্য কারো সনে।

যদি হতে সু মনের অধিকারী
প্রসাদি ফুল পরত যদি ঝড়ে,
রাজপুত্র তুমিই হতে রাজা
জয়ধ্বনি উঠত তোমার তরে।

আজকে যারা আহত তোমার জন্যে
একদিন তো জুড়বে তারা মননে,
মাভৈ রবে আসবে যখন ধেয়ে
দেখবে তখন শক্তি তোমার চেয়ে।

বিজ্ঞানমনস্ক বিদ্যাসাগর

বিপুল রঞ্জন সরকার

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

আরব সেনাপতি খলিফা আমরু ওমরের কাছে জানতে চান, লাইব্রেরিটি নিয়ে তিনি কী করবেন, খলিফা বলেন ঃ ''ঐসব বইয়ের বিষয়বস্তু কোরাণের সঙ্গে কি সঙ্গতিপূর্ণ? যদি সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে ওগুলি ছাড়া কোরাণই যথেষ্ট। যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে ঐগুলি ক্ষতিকারক। তাই ওগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হোক।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খলিফা ওমরের 'আলেকজান্দ্রিয়া-লাইব্রেরি' পোড়ানোর কাহিনী উল্লেখ করে বলেন, ভারতীয় পন্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য কিছুতেই তাঁরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের বিশ্বাস শাস্ত্রের উৎস সর্বজ্ঞ ঋষি। অভ্রান্ত। কেউ কেউ পুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রূপে বিবেচনা করে আধুনিক বিজ্ঞানের আগে স্থান দিতে চান। বক্তব্য, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অনেক আগে ভারতে এ সবের অস্তিত্ব ছিল। নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য তাঁদের সামনে উপস্থাপিত করা হলে পরিহাস করে উড়িয়ে দেন, বলেন, সবই ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে রয়েছে। তাঁদের মনোভাব বদলাবার নয়।

এটা নয় যে, প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানবিবর্জিত ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে দেখান, ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক চিন্তা এক সময়ে খুবই উন্নত ছিল। আধুনিক কেমিস্ট্রির উৎস পাশ্চাত্য ইউরোপের অ্যালকেমিস্ট, এই ধারণা তিনি নস্যাৎ করেন। ইউরোপীয়রা জ্ঞানার্জন করে আরবদের কাছ থেকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, আরব দেশীয়রা প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের রসশাস্ত্র (কেমিস্ট্রি) থেকে তাদের জ্ঞান লাভ করে। পিথাগোরাসের ২০০ বৎসর আগে ভারতীয়রা ইউক্লিডের প্রথম পুস্তকের ৪৭ তম প্রতিপাদ্য সমাধান করে। চরক এবং শুশ্রুত চিকিৎসা শাস্ত্র সহ শল্যচিকিৎসায় যে প্রভূত উন্নতি করেন, তারও উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে স্বীকার করেন, দার্শনিক দিক থেকে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের অভ্যুত্থান এবং সামাজিক দিক থেকে বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে জাতিভেদ প্রথার উৎকট উৎপাতে ভারতীয়দের সেই বিরাট ঐতিহ্য আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। ভারতীয়রা চিরকাল বিজ্ঞানভাবনায় দীন ছিল না; নানা দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সমৃদ্ধ বিজ্ঞান ঐতিহ্য ভেঙে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র এক প্রবন্ধে লেখেন ঃ ''ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণের ফলে হিন্দুদের অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে মেহনত করিতে হইয়াছে। চরম ধর্মতাত্ত্বিক মনোভাব কদাচিৎ অবরোহী (deductive) পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোনো পরিণতিতে পৌঁছায়। ফলত হিন্দুদের [চিন্তা]পদ্ধতি প্রায় পূর্ণতই বিশুদ্ধ অবরোহী প্রণালীর ছিল। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা দর্শন ও বিজ্ঞানের পক্ষে অবমাননাকর গণ্য হইত। এমনকী এই অবরোহী পদ্ধতিকেও সচরাচর ইহার যুক্তিযুক্ত পরিণতির দিকে যাইতে দেওয়া হইত না। কোনোরূপ ভিত্তি ছাড়াই প্রাথমিক সূত্রগুলি গৃহীত হয়, ফলত অবরোহী যুক্তিবিদ্যার অভ্রান্ত আয়ুধ আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও হিন্দু চিন্তাবিদগণ চরম কল্পনাত্মক সিদ্ধান্ত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রায় অলৌকিক মেধাসম্পন্ন মানুষের কাছে সত্য প্রায়শ নিজেকে প্রবল দীপ্তিতেই প্রকাশ করে, কিন্তু হিন্দু ঋষিরা তাহার অনুসরণে যুক্তিযুক্ত পরিণামে উপনীত হইলেন না। "

বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেশ কয়েক দশক আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শনের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, স্বীকরণ করার পর তিনি তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে শূন্যতা অনুভূত হয়, তা পূরণ করার জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে তাকান।

আধুনিক বিজ্ঞানের চরিত্র স্বতন্ত্র। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) ইন্‌ডাক্‌টিভ রিজনিং বা আরোহী তর্ক

পদ্ধতি, সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং সংশয়ী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য নিরূপণের পন্থা উদ্ভাবন করেন। অদ্যাবধি তাই অনুসৃত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের পন্থা ঃ *''প্রশ্ন কর অথবা যদি কোন তত্ত্ব থাকে, সযত্নে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ কর, ফলাফল বিশ্লেষণ কর, যুক্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হও। পুনরাবৃত্তি করে আবার পরীক্ষা কর এবং অন্যদের দিয়ে পরীক্ষা করাও। যদি অন্যরাও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হন, তাহলে তোমার তত্ত্ব সঠিক। কিন্তু পরবর্তী কোন সময়ে নতুন তথ্য বা আবিষ্কারের ফলে যদি দেখা যায় এই তত্ত্ব বা বিধি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না, তবে তোমার তত্ত্ব সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি তা বাতিলও হতে পারে।''*

ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক থেকে। আসেন অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামা, জন কোবোট, ফার্দিনান্দ ম্যাগ্‌গ্যালান। আসেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অভিযাত্রী এবং বণিক। তাঁদের লক্ষ ভারতের সম্পদ। নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধাতু এবং খনিজ পদার্থ সহ বিভিন্ন সম্পদ শোষণ একমাত্র লক্ষ্য। তাঁদের এই ভূমিকা পরোক্ষভাবে ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, উদ্ভিদতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচিন্তার প্রসার ঘটায়। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি বিজয়ের পর থেকে ।ইংরেজ শাসক ভারতের মাটিতে শক্তপোক্ত ভিত্ রচনা করতে সচেষ্ট। নব্য শাসকদের প্রয়োজনে এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ইংরেজের প্রয়াসে স্থাপিত হয় কিছু সংখ্যক আধুনিক প্রতিষ্ঠান। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে এমন সব ঘটনা ঘটে, যার প্রতি নজর না দিয়ে বাঙালির উপায় ছিল না। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ডেভিড হেয়ার উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেন হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনেও তাঁর ভূমিকা। ক্যালক্যাটা স্কুল বুক স্যোসাইটি প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেও তিনি। মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র হয়ে ওঠে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। ২৮ জানুয়ারি, ১৮৩৫ গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালক্যাটা মেডিক্যাল কলেজ। এশিয়াতে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে ভারতীয়রা বিলেত যাত্রা শুরু করে। তাঁরা ফিরে আসেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভাবনাকে আশ্রয় করে। প্রতিঘাত পরিলক্ষিত হয় সমাজে। বিজ্ঞান বিষয়ক নানা পত্র পত্রিকা প্রকাশ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকাশিত হয় পশ্বাবলী (১৮২২), বিজ্ঞানসেবধি (১৮৩২), বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩)। প্রকাশনাগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে, কিন্তু একটির প্রকাশ বন্ধ হলে অন্যত্র আরেকটির প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ সমাজে বিজ্ঞানচিন্তার প্রসার ঘটে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও রক্ষণশীল সমাজের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তথাপি এই প্রয়াস দমে যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় অন্ততঃ ৬৫টি বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

দেশ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। শুরু করেন রাজা রামমোহন রায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষটির প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তি আধারিত। তিনি বলেন, কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের অক্ষমতাই এর উৎস। তাঁর ভাষায়, ''অভ্যাস ও আচারের প্রভাবে কার্যকারণসম্বন্ধ সম্পর্কে অজ্ঞানতায় তারা বিশ্বাস করে যে (নানা ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রীতি অনুযায়ী) নদীতে স্নান করা, গাছকে পূজা করা, মঠভুক্ত হওয়া এবং উচ্চতর পুরোহিতের কাছ থেকে ক্ষমা কিনতে পারা - সারা জীবনের পাপমুক্তির কারণ। তারা মনে করে পূজ্য বস্তুর গুণে এবং পুরোহিতদের জাদুতেই পাপমুক্তি হয়, তাদের নিজেদের বিশ্বাস কিছু নয়, অথচ অবিশ্বাসীদের ওপর ঐ পূজ্যবস্তু বা পুরোহিতদের প্রভাবের কোন ফলই ফলে না।'' তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জাদুর মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ রূপে তিনি ইণ্ডাকটিভ লজিক অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে যুক্তি প্রয়োগের চর্চা করতে বলেন। বুদ্ধিমান লোকেরা এই যুক্তিবাদের সাহায্যে অতিপ্রাকৃতের খেলার প্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে। তিনি উপলব্ধি করেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টাতে না পারলে যুগযুগান্তের ঘুম থেকে জাতিকে জাগানো যাবে না। যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে তিনি সচেষ্ট হন। তাঁর দাবি, গণিত রসায়ন পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক

বিজ্ঞান পড়ানো হোক। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে জাতি মুক্তির আলো দেখতে পারে। ঊনবিংশ শতকে আলোকিত মননের অধিকারী রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভর ইন্ডাকটিভ বা আরোহী তর্কশাস্ত্রকে অনুসরণ করেন কারণ তাতে অনেক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার পরই সামান্যীকরণ করা হয়। অনেক তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার একটা প্রয়াস এই আরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়, বিজ্ঞানী চূড়ান্ত বলে তা গ্রহণ করেন না, কারণ তার পরও নতুন তথ্য বা আবিষ্কার আপাত সত্য বলে যা মনে হয় তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে।

ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন ১৮২৯, নয় বৎসর বয়সে। প্রায় বারো বৎসর অধ্যয়নের পর সমাপ্তি ১৮৪১-এ। ইতিমধ্যে ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলন ১৮৩০-এর দশকের প্রথমার্ধ ব্যাপ্ত করেছিল। রাজা রামমোহন, ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট সহ ১৮২০ এবং ১৮৩০-এর দশকের নানা ঘটনা, অভিঘাত বিদ্যাসাগরের সংবেদনশীল হৃদয় ও তীক্ষ্ণ মেধাকে ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত ছিল সংস্কৃত ও ইংরেজির জ্ঞানভান্ডারের সম্মিলিত সম্পদ দিয়ে ছাত্রদের সমৃদ্ধ করা যাতে তাঁরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারে। যুগোপযোগী আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতীয় সমাজকে উজ্জীবিত না করতে পারলে জাতির মুক্তি নেই বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি বিজ্ঞান চেতনার স্বাক্ষর সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন ঃ বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১)। লেখক হিসাবে তিনি সচেতন যাতে কোনও কুসংস্কার, অলৌকিকতা বা আধিদৈবিক বিষয়বস্তু প্রশ্রয় না পায়। শৈশব বা কৈশোরে কোমলমতি হৃদয়ে কোনও অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রভাব পড়লে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী।

'বাঙালার ইতিহাস' প্রণয়নে তিনি মার্শম্যানের শেষ ক'টি অধ্যায়কে অনুসরণ করেন। যা কিছু কুসংস্কার বিরোধী এবং যা বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটায়, তার প্রতি আলোকপাতে তিনি সমধিক যত্নবান। শিশু সন্তান বিসর্জন দেওয়া মধ্যযুগের একটি কুসংস্কার। সে সম্পর্কে তিনি লেখেন ঃ ''বহুকাল অবধি ব্যবহার ছিল পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, শিশু সন্তান সাগরজলে নিক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম ধর্মবোধে করিতেন বটে; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গভর্ণর জেনেরল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০শে আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন, ও তাহার পোষকতার নিমিত্ত, গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে।'' আবার লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গৃহীত শিক্ষাপ্রসারের কথাও গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন ঃ ''লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইংরেজী শিক্ষায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লামেন্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, রাজস্ব হইতে, প্রতি বৎসর, লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকা, প্রায় সামুদায়ই, সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ইংরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয়সংক্ষেপ, ও স্থানে স্থানে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, করিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে, ইংরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ..... দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।''

'জীবন চরিত' বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। এখানে মূলত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিজ্ঞানী ও মনীষীর জীবন ও আবিস্কার অথবা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। যাঁদের জীবনকথা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন, 'নিকোলাস কোপর্নিকস, গ্যালিলিয়, সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস লিনিয়স, বলণ্টিন

জামিরে, ডুবাল, তামস জেঙ্কিনস এবং সর উইলিয়ম জোন্স'। গ্রন্থটির প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লেখেন ঃ ''রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সংকলন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" সময়াভাবে তিনি উল্লিখিত কয়েকজনের জীবন পর্যালোচনা করে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। মন্তব্য করেন ঃ ''ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যাসংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গলা ভাষায় অসংগতি আছে; ঐ অসংগতি পূরণার্থে কোন কোন স্থানে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থলবিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সংকলন করিতে হইয়াছে, পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে তাহাদিগের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল।" আলোচিত প্রতিটি মানুষ প্রবল প্রতিকূলতা ও প্রতিরোধের মুখে পরাভব স্বীকার না করে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেন। বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে বিজ্ঞানসাধক এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের সঙ্গে বাঙালি শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর পাঠক সাধারণের পরিচয় করিয়ে দিতে আগ্রহী। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সেই প্রয়াস পরিস্ফুট। কোপারনিকাস সম্পর্কে লেখেন ঃ ''অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানালোক সম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি পূর্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি। পূর্বকালীন লোকেরা বিচারে সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয় তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্মলমণীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিংসবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা। এই মত পূর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ তৎকালীন ইয়ুরোপীয় লোকেরা বোধ করিতেন, বায়বলেরও স্থানে স্থানে উহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াস-সম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।"

গ্যালিলিও সম্পর্কে তিনি লেখেন ঃ ''তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। ....তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্মসভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন আর আমি এইরূপ সঙ্ঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না।" গ্যালিলিও জোতির্বিদ্যার অনুশীলনে বিরত না হয়ে নিজের মত প্রচার করার জন্য উদ্যোগী হন। ''কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্টরূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন।" এরপর বিদ্যাসাগর দেখান কীভাবে আবার গ্যালিলিওকে ধর্মসভায় উপস্থিত হতে হয় এবং স্থান হয় কারাগারে। স্যার আইজ্যাক্ নিউটন সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লেখেন, ''১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতিপ্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে

গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে।" তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তিনি এই রচনায় উপস্থাপিত করেন।

তাঁর একমাত্র চিন্তা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলবন্ধন যুগান্তের সূচনা করতে পারে। অন্যথায় শত শত বৎসরের জড়তা ও সংস্কার থেকে জাতির মুক্তি নেই। এই মুক্তি অগ্রগতির প্রাক্ শর্ত। বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতের সমাজকে উজ্জীবিত করাই তাঁর লক্ষ্য। পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক বিকাশ যাতে তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হয়ে উঠতে পারে।

'বোধোদয়' বিদ্যাসাগরের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেখানে তিনি এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যা বিজ্ঞান চেতনায় পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। গ্রন্থটির উপসংহারে তিনি বেশকিছু সংখ্যক দুরূহ শব্দের অর্থ সন্নিবেশিত করেন। গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন ''যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধকরি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি...." অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- পদার্থ, চেতন পদার্থ, ইন্দ্রিয়, ভাষা, কাল, গণনা-অঙ্ক, বস্তুর আকার ও পরিমান, ধাতু, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ, দস্তা, মুদ্রা, হীরক, কাঁচ, জল-নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, কয়লা, কৃষিকর্ম ইত্যাদি। ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। বর্তমান যুগের পক্ষেও ভাষা যে সহজবোধ্য, উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। পদার্থ সম্পর্কে লিখছেন ঃ ''আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেইখানে থাকে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।"

বিদ্যাসাগর 'গণনা - অঙ্ক' শীর্ষক রচনাটিতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিসরে পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা দিতে সচেষ্ট। ''বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা - এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া উহাদের স্থলে ১, ২ প্রভৃতি অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই —

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য

যেমন্ বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা্ সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে সহস্র বুঝায়।" এভাবে সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে যার প্রাথমিক পরিচয় আছে, তাকে অঙ্কের জগতে প্রবেশ করানোর প্রয়াস করা হয়। বিজ্ঞানমনস্ক না হলে একজন সাহিত্য রচয়িতার এই ধরণের বিষয় চর্চার প্রয়োজন হত না। আন্তরিকভাবে তিনি উপলব্ধি করেন, প্রতিটি শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী সহ সমাজের

প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চার করা একান্ত প্রয়োজন। তারই ফসল এই গ্রন্থটি। এখানে পদার্থবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্ক সহ প্রাকৃতিক ভূগোলচর্চার প্রাথমিক ও অপরিহার্য পাঠ স্থান পেয়েছে।

বর্ণপরিচয় এবং বোধোদয় দু'টি গ্রন্থই ইংরেজ সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪) স্কটিশ খ্রিস্টান মিশনারি। কিছু সময় শ্রীলঙ্কায় কাটিয়ে তিনি এদেশে আসেন এবং খ্রিস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশান সোসাইটির এজেন্ট ও ভ্রাম্যমান সচিব রূপে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জন মার্ডক 'বর্ণপরিচয়' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গোঁড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্বেষমূলক আক্রমণ করেন।

'সীতার বনবাস' (১৮৬০) বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য এক সাহিত্যকীর্তি। গ্রন্থটির বক্তব্য শীর্ষনাম অনুসারী। আমাদের আলোচ্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি নয়। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে সীতার অন্তিম পরিণতি বর্ণনা ঃ ''...এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। ...জানকী এই রূপ শপথ করিতেছেন ইত্যোবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্ন শোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়াছে এবং উহা অপূর্ব ও সুসজ্জিত। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন।'' (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত রামায়ণ থেকে সংগৃহীত) বিদ্যাসাগরের এই অলৌকিক বর্ণনা পছন্দ নয়। যুক্তিনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী মানুষটি সীতাকে রক্তমাংসের মানুষ রূপে গ্রহণ করে তাঁর অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন, তা বিজ্ঞানসম্মত।'' ...বাল্মীকি অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়াছে, অদ্যাপি তাহা অপনিত হয় নাই, অতএব তুমি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতিক্ষণেই প্রতিগ্রহপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।... বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।'' এখানে অলৌকিকতাবর্জিত বর্ণনা সর্বাংশে বাস্তবোচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের মতো বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন যে সব কার্যকর বিজ্ঞান, যথা গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি সহ নানা প্রযুক্তি ইউরোপীয় জাতিগুলিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে সাহায্য করছে, সেই ধরণের উদার বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তিত হোক। তাঁর অভিপ্রায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক। তাই তাঁর 'জীবনচরিত' রচনা। তাঁর অভিপ্রেত কোমলমতি কিশোর বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক। রচনা 'বোধোদয়'। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে প্রবেশ লগ্নে বাংলা গদ্যের বয়স সবে চার দশক। ভাষা, শৈলী অপরিণত। সকল বিষয় প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা নানাবিধ কারণে তখন কঠিন। সর্বাধিক প্রতিবন্ধকতা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব। অক্ষয়কুমার দত্ত সযত্নে পরিভাষা সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। বিদ্যাসাগরও এই অভাব উপলব্ধি করেন। বহুবিধ কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় তাঁর জীবনে এ বিষয়ে এককভাবে মনঃসংযোগ করার অবকাশ ছিল না। তথাপি তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যুক্তি ও বিচারপ্রণালী দিয়ে উপলব্ধি করেন, পন্ডিত সমাজকে নিরস্ত্র করতে হবে তাঁদের অস্ত্রে এবং লড়তে হবে তাঁদের মাঠে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ রদ করার জন্য তিনি যে ক্ষুদ্র এবং বৃহদাকারের গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন, তার যুক্তির বিন্যাস বিস্ময়কর। সুবিশাল শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় বিচার সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য তিনি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সাজিয়ে নেন। অতঃপর প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য যুক্তিজালের বিস্তার ঘটান। কিন্তু বিদ্যাসাগর

শাস্ত্রের বিচারে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর আবেদন, বৃহত্তর মানব সমাজের কাছে। মানুষকে বিচার করতে হবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সব ছাপিয়ে ওঠে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বা বৈজ্ঞানিক মানবতা। কারণ তাঁর কথা ঃ ''দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন।''

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারেও ঈশ্বরচন্দ্রের আর্তির আবেদন চিরন্তন। তিনি কখনও 'দেশাচারের দাস' নন। সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত বা আবশ্যক বোধ করেন, তা-ই করেন. 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি' নিয়ে বিদ্যাসাগরের খেদ ঃ ''ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাপিত্য করিতেছিস! তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আপিত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্বধর্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষা গুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরনীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।'' দেশাচারের প্রবল দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার পাশাপাশি তিনি সর্বসাধারণের বিবেক ও মানবিকতার কাছে কাতর আবেদন জানান ঃ ''তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। .... হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।''

বিদ্যাসাগর উদ্দেশ্যবিহীন কোনও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেননি। প্রতিটি গ্রন্থ শধু নয়, প্রতিটি লাইন রচনার নেপথ্যে জাগরুক এক সচেতন মন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তোলার জন্য যে নানাবিধ প্রয়াস করেন, তার অন্যতম ভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা ছিল দুরূহ বিষয়। না বুঝে মুখস্থ ছিল একমাত্র উপায়। সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে তিনি এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। শিক্ষার্থীরা চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে 'অবৈজ্ঞানিক বাঙালীর প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' বলে নির্দেশ করেন।

১৮৬০-এর দশকে কলকাতায় বিজ্ঞান আন্দোলনে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'। ১৮৭৬ -এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং তাঁর সহযোগী রেভারেন্ড ফাদার ইউজেন ল্যাফণ্ট। বিদ্যাসাগর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক হাজার টাকা দান করেন। বিজ্ঞানসংস্থাটি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহেন্দ্রলালকে নিয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করেন। যান পাথুরিয়াঘাটার রাজার কাছে। তিনি জানতে চান, কত দিতে হবে। বিদ্যাসাগর দশ হাজার টাকা দাবি করেন। রাজা পাঁচ হাজার টাকা দান করেন এবং অবশিষ্ট অর্থ আরেক কিস্তিতে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বাইরে বেরিয়ে হতবাক মহেন্দ্রলাল বলেন, তিনি ভেবেছিলেন দুই-এক হাজার টাকা চাইবেন। বিদ্যাসাগর রসিকতা করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। তাই ভিক্ষা কী করে করতে হয় জানেন।

আট বৎসর বয়সী ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রখর যুক্তি ও বিচারপ্রণালী দিয়ে সত্যে উপনীত হন, বাকি জীবন সেই ধারা অটুট থাকে। ভারতীয় তর্কশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং তর্কবিদ্যার প্রভাবে তাঁর সেই যুক্তিবিন্যাস অধিকতর শাণিত এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়।

‘‘প্রকৃতি - মানুষ - পরিবেশ’’

অঞ্জয় কুমার শাসমল
(সভাপতি ও প্রাক্তন শিক্ষক)

আমরা প্রকৃতির কোলে মানুষ। প্রকৃতি আমাদের মা। আমরা মায়ের কোলে মানুষ। আর প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়েই তো পরিবেশ। এই পরিবেশ তো শান্ত-নিবিড় ও প্রাণময়। প্রকৃতি — গাছ-পালা, নদ-নদী, সাগর, পাহাড় ও পর্বতকে নিয়ে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা-কে নিয়েই তো মহাকাশ। বিপুলাকায় আকাশ ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। আর এসবের সৃষ্টিকারী শক্তিও অদৃশ্য। যেমন — মানুষের মধ্যে মনুষত্ব, মায়া-মমতা, ভালবাসা অদৃশ্য। তবুও এসবের মধ্যে শক্তি আছে। আছে নীরবতার ছায়া। দেহের আড়ালে আছে আত্মা। তাকে তো দেখা যায় না। আত্মাতো সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। তাকে আমরা দেখতে না পেলেও মৃত্যুর পর আমরা কেন ‘আত্মা’র শান্তি কামনা করি, তেমনি পরিবেশকে আমরা দেখতে না পেলেও, আমরা সুস্থ পরিবেশে থাকার কামনা করি।

মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। আমরা জানি বনে বাঘ থাকে, গাছে পাখি থাকে, আর জলে থাকে মাছ। এদের পরস্পরিক সম্পর্ক ও বেঁচে থাকার উপর পরিবেশের সুস্থিতি বজায় থাকে। প্রকৃতির পরিবেশ থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি, আর তার বদলে আমরা ফিরিয়ে দিই কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

পরিবেশের জল - বায়ু - মাটি আমাদের বেঁচে থাকার রসদ যোগায়।

মানুষকে ঘিরে জড় ও জীবের উপাদানগুলিকে পরিবেশ বলে। জল-বায়ু-মাটি, সূর্যালোক হল জড় উপাদান; আর উদ্ভিদ, নানান পশু-পাখী, মানুষ হল জৈব উপাদান। উভয়ের উপস্থিতি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এরা উভয়ে না থাকলে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আকাশ ভরা বাতাস, মাটি ভরা গাছ, পুকুর ভরা জল, আর মহাকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু আজ মানুষ - জল - বায়ু - শব্দ দূষণ পরিবেশকে বিষময় করে তুলেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে আজ মানুষ দূরকে কাছে করেছে। চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা সফল হয়েছে। আর পারমানবিক শক্তি আবিষ্কার করে বায়ুকে দূষিত করছে। ফলে মানুষ নানা রোগের কারণে অকালে মারা যাচ্ছে।

যে জল আমাদের জীবন — সেই জলকে আমরা নানা দিক দিয়ে দূষিত করছি। কল-কারখানার বিষাক্ত জল, মানুষের ত্যাগ করা জৈব পদার্থ — নালা, জলাশয় ও নদীতে ফেলে দূষিত করছি। আর বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ জলে ও মাটিতে ফেলে জল - বায়ু আর মাটিকে বিষাক্ত করছে তার পরিসংখ্যান নেই। কারণ প্লাস্টিক থেকে যে ক্ষতিকারক রাসায়নিক সৃষ্টি হয় তা হল ‘বিসফেনল-এ’ যা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগকে নিয়ন্ত্রণ করে আনছে — যার ফলে থাইরয়েড সমস্যা, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি হয়।

আজ বায়ু দূষিত হওয়ায় দেশে অতিমারী দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় আমরা মাটিকে নষ্ট করে দিয়েছি। ফলে ঐ মাটিতে উৎপন্ন ফসল খেয়ে আমরা নানা রোগের আক্রান্ত হচ্ছি। আমরা যদি মানুষকে নীরোগ হয়ে বাঁচার ইতিবাচক দিকটিকে না দেখি — তাহলে আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

কাজেই আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে —

‘পৃথিবীকে করে যাব শিশুর বাসযোগ্য ভূমি।’

আর প্রকৃতি মায়ের কাছে বিশ্বকবিকে স্মরণ করে আমার ভাষায় বলি —

‘বিশ্বের মাটি, বিশ্বের জল
বিশ্বের বায়ু, বিশ্বের সন্তান
করোনা মুক্ত হোক, ভাবনা মুক্ত হোক
— হে ভগবান।’

কল্প যাত্রা

সূর্য শেখর সুর, (অষ্টম শ্রেণী)

তার চোখে মুখে বিস্ময়। নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছোঁয়া। তিনি কি ভেবেছিলেন যে তাকে এমন বিপদে পড়তে হবে? সময়টা ২২০০ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যার। অবশ্য সেটা শুধু ঘড়ি দেখেই বোঝা সম্ভব। কারণ এখন কৃত্রিম সূর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই সরকার যখন ইচ্ছা দিন, যখন ইচ্ছা রাত করতে পারে সুবিধা ও অসুবিধা অনুযায়ী। চারিদিকে কাঁচের সারি সারি বিল্ডিং। নিজের অফিসে বসে আছেন প্রফেসর 'R'। তিনি ছাড়া অফিসে আর কোনো জনমানব নেই, তবে বিল্ডিং যে খালি তা নয়। নিজেদের কাজ করে চলেছে অসংখ্য যন্ত্রমানব। প্রফেসর 'R' এর বয়স 150 বছর কিন্তু তার চেহারা এক যুবকের মত। তবে সবই সম্ভব হয়েছে অন্তহীন বয়সের ওষুধের জন্য।

প্রফেসর 'R' তখনো ভাবছেন যে কাকে তার আবিষ্কারের প্রয়োগের জন্য বাছা যায়।

আসলে এটা তার ঠাকুরদার আবিষ্কার। তিনি এ যন্ত্র বানিয়েছিলেন সময়ে ভবিষ্যত এ যাওয়ার জন্য। তাই একে এক কথায় টাইম মেশিন বলা চলে। তিনি এ যন্ত্র ব্যবহার করতেন ভবিষ্যতে গিয়ে নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য চুরি করে আনতে। সেই তথ্য দিয়ে তিনি পরে নানান জিনিস আবিষ্কার করতেন। এই ব্যাপারটি শুধু জানতেন প্রফেসর 'R' এবং তাদের বাড়ির কয়েকজন। এই অন্তহীন আয়ুর ওষুধও তারই তৈরি।

এবারে তার ঠাকুরদার ইচ্ছে ছিল একপ্রকার হিপনোটাইসিং মেডিসিন বানানো ও সেটা ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর লোককে তার অধীন করা। অবশ্য এটা তিনি প্রফেসর 'R' কে জানাননি। তবুও তার মধ্যে ব্যাকুলতা রয়েই গিয়েছিল।

এই ব্যাকুলতা দেখেই প্রফেসর 'R' বুঝতে পারেন প্ল্যানটির ব্যাপারে। আর এও বুঝেছিলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই সেটি বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তাই প্রফেসর 'R' তার ঠাকুরদার যন্ত্রটিতে কিছু সংযোজন করে সেটিতে অতীতে যাওয়ার যোগ্য বানিয়েছিলেন।

তাই আজ এত ভাবনা তার মস্তিষ্কে ঘুরছে। তার বাবাও চেষ্টা করেছিলেন তার ঠাকুরদাকে আটকাবার, তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেবার তার আবিষ্কার এর বিষয় ছিল এক নিশ্চিহ্ন অস্ত্র। যা যে কেনো প্রাণীকে এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। এই অস্ত্রের জন্যই প্রাণ হারান প্রফেসর 'R'-এর বাবা ও পরিবারের বাকি সকলে। এর জন্যই কিছুটা সংযত থাকতে হয়েছিলো প্রফেসর 'R' কে। তবে তিনি আর শান্ত থাকতে পারবেন না।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ঠিক করলেন যে তিনিই যাবেন সেই যন্ত্রে সেই সময়ে যখন তার ঠাকুরদা সেই নিশ্চিহ্ন-অস্ত্র বানাচ্ছিলেন। প্রফেসর 'R' এর বয়স তখন ছিল 13 বছর। তিনি পণ করলেন যে সেই নিশ্চিহ্ন অস্ত্র দিয়েই তার ঠাকুরদাকে নিশ্চিহ্ন করবেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ, তিনি ঠিক মধ্যরাতে টাইম মেশিনে চেপে রওনা দিনের সুদূর অতীতে 137 বছর আগের এক রাতে তাদের বাড়ির ঠিকানায়।

তার একবার মাথায় এসেছিল যে তিনি সেই সময়ে গেলে আবার 13 বছরের হয়ে যাবেন। তবুও তার মুখে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না।

তিনি যখন তার বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছলেন তখন তাকে দেখলে প্রফেসর R বলতে দ্বিধা হয়। এক জীর্ণ শীর্ণ চেহারার বালক যার মাথা রুক্ষ বাবরি চুল। এর থেকেই বোঝা যায় যে তাদের অবস্থা বেশ মধ্যবিত্তই ছিল। আর এই অবস্থা থেকে বেরোবার আশায়-লালসায় তার ঠাকুরদা মেতেছিলেন কুকর্মে।

এখন প্রফেসর R যে বাড়ির দিকে গেলেন সেটি অত্যন্ত ছিমছাম একটি দোতলা বাড়ি। তারপর তিনি বাড়ির পাইপ

বেয়ে উঠে পড়লেন বাড়ির ছাদে। যেখানে গিয়ে ছাদে থাকা স্কাইলাইটের কাঁচ সরিয়ে নামলেন বাড়ির ভেতরে। তিনি তখন তার দাদুর ঘরের দিকে গিয়ে দেখলেন তিনি ঘরে নেই।

এরপরে তিনি গেলেন তাদের বাড়ির বেসমেন্টে। সেখানে দরজার উপরে টাঙানো কীপ-আউট লেখাটি।

সেখানে ঢুকতেই তিনি চমকে গেলেন।

''এ যেনো অন্য এক জগৎ।'' তিনি মনেমনে বললেন।

সেই জায়গাটির আয়তন প্রায় একটি শহরের মতন। চারিদিকে দেওয়ালে এলইডি ডিসপ্লে লাগানো বহুতল বাড়ি। আকাশে উড়ছে অসংখ্য ড্রোন। সেই ডিসপ্লেগুলিতে একজন বেশ বয়স্ক লোক বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই দিকে তাকিয়ে অসংখ্য রোবট তার বক্তৃতা শুনছে। লোকটিকে দেখলে বেশ ধনী বলে মনে হলেও বেশ শীর্ণকায় চেহারা।

প্রফেসর R এর মনে হলো যে এনাকে তো তিনি চেনেন। ইনিই তো তার ঠাকুরদা প্রফেসর 'A', প্রফেসর অলকেশ ব্যানার্জী। তার বক্তব্য শুনে সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর R । হঠাৎ তার নাম শুনে চমকে উঠলেন তিনি।

সেই ডিসপ্লে থেকেই তো তার ঠাকুরদা তার নাম ধরেই ডাকছেন।

''রাকেশ, তোমাকে স্বাগত আমার জগতে, 'সাইবার ডমে।''

হঠাৎ করে নিজের আসল নাম শুনে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারই আসল নাম রাকেশ ব্যানার্জী। কিছুক্ষণ তিনি এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর ফের তাকালেন ডিসপ্লের দিকে। তার ঠাকুরদা আবার বলে উঠলেন,

''হ্যাঁ রাকেশ ওরফে প্রফেসর 'R' তোমাকেই বলছি দাদুভাই।'

''না'', এবার বলে উঠলেন প্রফেসর 'R' ''আমাকে আর আপনার সম্পর্কে জড়াবেন না। আপনি অতি নিচ ও অতি হীন। আপনি একজন খুনি। আপনাকে দাদু বলতে আমার লজ্জা করে।'' কথাটি বলতে কেঁপে উঠলো প্রফেসর 'R' এর তরুণ গলা।

মৃদু হাসলেন প্রফেসর 'A'। বললেন, ''তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আমার উদ্দেশ্য সফল হতো না।'' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন, ''যদিও আমার একটি স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি তা হলো আক্রমণকারী রোবট বানানো, যারা আমার নির্দেশে যে কাউকে মারতে পারবে। তাই আজ আমি তোমাকে নিজের হাতেই মারবো। জানি যে তোমার বাবাকে নিশ্চিহ্ন করার সাথে সাথেই তোমারও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা তবে তা তো হয়নি কারণ তুমি আমার বানানো ওষুধ খেয়েছিলে। তবে এখন আর সে সুযোগ নেই। কারণ তোমার এই বয়সে সেই ওষুধ খাওয়া হয়নি।'' একটু থেমে আবার বললেন, ''তুমি ভাবছো না যে তোমার আসার কথা আমি কী করে জানলাম? আমার বানানো টাইম মেশিন দিয়ে।'' এই বলে তিনি একবার অট্টহাসি হাসলেন এবং এক বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলেন হাতে নীল বেশ লম্বা একটি পিস্তল নিয়ে।

তিনি এরপর সেটি তাক করলেন প্রফেসর 'R' এর দিকে, তারপরে ট্রিগারটি টিপতেই যেখানে প্রফেসর 'R' দাড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধোঁয়া বেরোনোর পর প্রফেসর 'R' কে আর দেখা গেলো না।

তবে কি প্রফেসর 'R' ও ব্যর্থ হলেন তার বাবার মতো? প্রফেসর A কে কি কেউ আটকাতে পারবে না?

এর পরে যা ঘটলো তা প্রফেসর A এর কাছে একেবারেই আশাপ্রদ নয়।

তিনি দেখলেন তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর R এবং হাতে সেই নীল পিস্তল। তাক করে আছেন প্রফেসর A এর দিকে।

প্রফেসর R নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন তবে সেটা তার গ্যাজেট টেলিপোর্টারের এর জন্য। প্রফেসর A তার ব্যাপারে সব জানলেও এর ব্যাপারে জানতেন না।

এরপরেই ঘটলো সেই ঘটনাটি, যা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা।

প্রফেসর R পিস্তলটি তাক করলেন প্রফেসর A এর দিকে এবং বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। তার কানে এলো প্রফেসর A

বলছেন, ''তুমি বাঁচবে না, তুমি বাঁচবে না।''

তবুও তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। পরমুহূর্তেই প্রফেসর A নিশ্চিহ্ন হলেন।

এরপরেই প্রফেসর R হেসে উঠলেন তবে তা জয়ের হাসি নয়। তা হলো খলের হাসি।

তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ''এ পৃথিবী আমার, আমি এর রাজা। তুমি কি ভেবেছিলে যে আমি তোমাকে মেরেই শান্তি পাবো? আমি এই পৃথিবীতে রাজ করবো। হা হাহা হাহা।''

তবে তার আশা পূরণ হলো না। কারণ তার দাদু না থাকলে তার বা তার পরিবারের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এটা তিনি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন।

তার চোখে মুখে বিস্ময়। নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছোঁয়া। তিনি কি ভেবেছিলেন যে তাকে এমন বিপদে পড়তে হবে? ধীরে ধীরে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার। তবে পরমুহূর্তেই তিনি এক পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। আর সেখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ে গেলো।

সেই 'সাইবার ডম' ও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

পৃথিবীর আর উন্নত হওয়া হলো না। যদিও এমন পৃথিবী আমাদের চাইনা। যেখানে কেউ নিজের আপনজনদেরও মারতে পিছপা হয় না। পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থাকুক। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

ফেলুদাকে চিঠি

ঋতাদৃত মল্লিক,

সপ্তম শ্রেণি (ইংরেজি মাধ্যম) ক্রমিক সংখ্যা - ৫

প্রিয় ফেলুদা,

আশা করি, তুমি ভালো আছো। তোপসে (তপেশ রঞ্জন মিত্র) এবং জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলী) ও ভালো আছেন নিশ্চয়ই। অনেকদিন তোমার রহস্যের নতুন কোনো গল্প পাইনি। তোপসে কি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে? তাহলে ওকে বলো, ও যেন আবার লিখতে শুরু করে।

বর্তমানে প্রায় দেড় বছর ধরে আমরা গৃহবন্দী। এর কারণ করোনা নামক এক মারণ ভাইরাস। আমার ধারণা তুমি এই ভাইরাসের কীর্তিকলাপের কথা ইতিমধ্যেই শুনেছো। যদিও টিকাকরণের মাধ্যমে বড়দের এই রোগের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব তবুও আমরা অর্থাৎ ছোটরা এখনো নিরস্ত্র। এর মধ্যেই করোনার তৃতীয় ঢেউ এসে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা আর তার সঙ্গে বাচ্চাদের ও বিপদ আসন্ন।

এমতাবস্থায় আমাদের একমাত্র ভরসা শঙ্কুদাদুর মিরাকিউরল বড়ি। কিন্তু বর্তমানে যে তিনি কোথায় আছেন, সে ঠিকানা আমরা জানিনা। তাই তোমাকে অনুরোধ তুমি তাঁকে খুঁজে বের করে এই মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বড়িগুলো নিয়ে চলে এসো। আর তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপচারিতার খুঁটিনাটি আমরা যেন তোপসের কলমে এই বছরের কোনো একটি পুজো সংখ্যায় পাই। সঙ্গে যদি জটায়ুর লেখা কোন রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস থাকে, তাহলে গৃহবন্দি অবস্থাতেও আমাদের এই বছরের দুর্গাপুজোটা 'জমজমাট' হয়।

জটায়ু আর শঙ্কু দাদুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি আর তোপসে ভালোবাসা নিও। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থেকো।

ইতি তোমার ভক্ত
ঋতাদৃত

মায়াবী যামিনী

রূপম শিকদার,
(দশম শ্রেণী, বিভাগ - ক, রোল - ৫)

আজ সকাল সাড়ে দশটায় মার অনেক ডাকাডাকির পর উঠলাম, সাধারণত সাতটা-সাড়ে সাতটা আমার ঘুম থেকে ওঠার সময় কিন্তু গতকাল রাতটা আমার পক্ষে একটু অসাধারণই কেটেছে। জানি না বিশেষণ প্রয়োগটা উপযুক্ত হল কিনা, মনে হয় ''অসাধারণ''-এর চেয়ে ''অপ্রাকৃত'' বলাই শ্রেয়। মনে হয় না আমার অবচেতন মন কোনোদিনও কালকের রাত্রিকে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে দেবে। কালকের ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই আজ কলম নিয়ে বসা।

কাল সন্ধ্যাতেই ঠিক হয় যে মা রাত্রিটা বড় পিসির বাড়িতেই কাটাবে। বড় পিসি বড় অসুস্থ, মারণরোগ ক্যান্সারের শিকার। দাদা অর্থাৎ বড় পিসির ছেলে কিছু কাজে বাইরে থাকবে, তাই কেবল রাতের জন্য মাকে অনুরোধ করে বড়পিসির সাথে থাকতে, মা স্বভাবতই রাজি হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হয় আমাকে নিয়ে, আজ অবধি তো একা বাড়িতে রাত কাটাইনি, তাই। বাবা থাকলে তো কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু বাবাও তাঁর এক বন্ধুর বিয়ের জন্য কলকাতায়। অর্থাৎ মার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমি পুরো বাড়িতে একা হয়ে যাবো। এই ব্যাপার নিয়ে আমি মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু মা-ই বারংবার চিন্তা প্রকাশ করছিল। বলেছিল, আমি যেন রাতটা মার সঙ্গে বড় পিসিদের বাড়িতেই কাটাই। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ি, শতহোক আমি নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন হতে দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমার জেদের জিত হয় এবং ঠিক হয় আমি একাই থাকবো। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে প্রায় সমস্ত রকম সাবধান বাণী শুনিয়ে দিয়ে মা বেড়োয়। বড়পিসিদের বাড়ি আমাদের দুটো বাড়ি পরেই। আমি দরজায় দুটো তালা দিয়ে ঘরে চলে আসি। অন্যদিনগুলো রাত বারোটাতে শুতে যাই। আজও তাই ভাবলাম ''ব্যোমকেশ সমগ্র'' পড়েই এতটুকু সময় কাটিয়ে দেবো। মোবাইল ঘাটার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মার কৃপায় তা হয়ে উঠত না। তিনি আমার এই প্রবৃত্তির আশঙ্কাতেই মোবাইল তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই অগত্যা টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে ''ব্যোমকেশ''-এর ''আদিম রিপু'' নিয়ে বসলাম। প্রায় অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছিল, আর দুদিন পড়লেই বোধহয় শেষ হয়ে যেত। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে পৌঁছাল, আমিও বইয়ের মাঝে বুকমার্ক ঢুকিয়ে রাতের মতো পড়া শেষ করলাম, গরম বেশী ছিল না তাও অভ্যেস বশে ক্ষণিকের জন্য AC চালিয়ে ছিলাম। Timer Off এক ঘন্টা পর করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কেন জানিনা ঘুম আসছিল না, বারবার এদিক-ওদিক ঘুরে সঠিক নিদ্রাভঙ্গিমার খোঁজ করছিলাম। ক্রমে ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে পৌঁছাল, যা বোধগম্য হল AC বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে। ভাবলাম, যদি বারান্দায় একটু পায়চারি করে ঘুম আসে, তাই তার প্রচেষ্টায় বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরের দরজা খুলতেই আমি চমকে উঠলাম, একঘন্টা AC চলার পর ঘর স্বভাবতই যথেষ্ঠ ঠান্ডা ছিল, তাই ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গরম হলকা লাগার কথা কিন্তু বাইরের ঘর যেন আমার শোবার ঘরের মতোই ঠান্ডা। কিন্তু জুনের প্রথম দিকে এই রকম ঠান্ডা আবহাওয়া বাস্তবিক রূপে অসম্ভব এবং আরোই অসম্ভব কারণ এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির কোনো নাম গন্ধ নেই। অদ্ভূত হলেও তখন এই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। পাশের ঘরের দরজার ছিটকিনি খুলে বারান্দায় আসলাম। বাইরের দিকে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম, রাত্রিটা যেন নববধূর মতন করে এক মায়াবী নিকষ কালো অন্ধকারের ঘোমটা দ্বার নিজ মুখশ্রী আবৃত করেছে, আকাশে দু-তিনটে নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছিল, রাস্তার লাইটটা দুদিন ধরে খারাপ বারবার জ্বলছে-নিভছে, সামনের হিমসাগর গাছে আমসহ পাতাগুলো বাতাসের মৃদুশব্দ দোলায় দোল খাচ্ছে, অগুনতি জোনাকী পাঁচিলের পাশের নারকেল গাছের মাথায় যেন এক অপরূপ সুন্দর আলোক উৎসবের

আয়োজন করেছে, বাইরেও ভালো ঠাণ্ডা আবহাওয়া মনে হয় যেন নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়। প্রকৃতি যেন আজ কোনো এক মায়াবী রূপকথার রাজ্য রচনা করেছে, এই শহরের বুকে। আজ অবধি কোনোদিন এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে উঠতে পারিনি। শুধু এইটুকুই নয়, একটা সুগন্ধি ফুলের সুবাসও যেন নাকে আসছিল, সম্ভবত ল্যাভেন্ডার, কিন্তু এদিকে তো কারোর উঠোনেই এই গাছ নেই। এছাড়াও এক মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ সুরও যেন দূর থেকে কানে আসছিল, খুব চেনা সুরটা তবে মনে করতে পারিনি। সবমিলিয়ে পরিবেশে যেন একটা ভৌতিক ছোঁয়া ছিল। মনে ভয়ের উদ্রেক হলেও মায়াময় রাত্রিটাকে উপভোগ করতেই আগ্রহী হই। বারান্দার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে স্থির চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে থাকি। চেয়ারে কতক্ষণ বসে আছি খেয়াল নেই, একটু ঝিমঝিম ভাব চলে এসেছিল। হঠাৎ শোবার ঘর থেকে মোবাইল বেজে উঠে, ঘুমের চটকটা নিমেষে ভেঙে যায় এবং আমি ঘরে ঢুকি কিন্তু মোবাইল আর বাজছে না। মোবাইলটা খুঁজতে যাই এবং হঠাৎ বিদ্যুৎ-এর মতন আমার মনে পড়ে যায় মোবাইলতো ঘরেই নেই। মোবাইলতো মা নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আছে একটা ছোটো মোবাইল তবে তার রিংটোন এরকম না কিন্তু কিছুক্ষণ আগে শোনা রিংটোনটাতো আমার মোবাইলেরই ছিল। আমার মাথা কেমন ঘুরে যায়, বারান্দার চেয়ারে এসে বসি। কিছুটা ধাতস্থ হবার পর মনে হয় ঘুমের ঘোরেই হয়তো ভুলভাল শুনেছি, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। আবারও বাইরের দিকে তাকাতেই পুনরায় মোহিত হয়ে পড়লাম রাতের মোহতেই। তাকিয়েই আছি, হঠাৎ শুনতে পাই কুকুরের আওয়াজ, আওয়াজটা আমার চেনা, রাণীর গলা, আমাদের বাড়ির এদিকেই থাকে ও, আওয়াজ শুনে, ''আই, আই'' করে ডাকলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচিল টপকে সে হাজির, দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় জানাল যে সে ক্ষুধার্ত। আমি ওকে দুটি বিস্কুট দেওয়ার জন্য রান্না ঘরের দিকে গেলাম। কৌটো খুলে দুটি বিস্কুট বের করে নিয়ে বারান্দায় ঢুকতেই দেখি, কোথায় রাণী? জনপ্রাণী নেই দরজায়। অনেক ডাকলাম কিন্তু এল না। এঘটনা আজ অবধি হয়নি। যখন ওর দুমাস বয়স সেই তখন থেকে ওকে সিরিঞ্জ দিয়ে দুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে, ওকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ভ্যাকসিন দেওয়ানো সব আমিই করেছি। ক্রমে সে তেজস্বী হয়ে উঠে কিন্তু আমার প্রতি ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি বরং বহুগুণে বেড়েছে। যেমন যেখানে থাকুক আমার ডাক শোনা মাত্রই সে উপস্থিত। ওর নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, তাই ওর নাম দিয়েছিলাম ''রাণী''। বুঝতে পারলাম না কেন ও এল না, ঠিক করলাম কাল সকালে খুব করে বকে দেবো। এবার ঘরে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছুঁই ছুঁই। ভাবলাম এবার শুই গিয়ে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরেটা যেন আমার ছাড়তে চাইছে না, এক অমোঘ টান অনুভব করলাম কিন্তু পরদিন উঠতে দেরী হয়ে যাবে ভেবে নিজের প্রকৃতি প্রেমী সত্ত্বাকে কাবু করতে হল। দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় উঠতে যাচ্ছি ঠিক তখনই এক সুমিষ্ট মহিলা কণ্ঠে আমার নিজের নাম স্পষ্ট শুনলাম, স্বরটা যেন বড় আকুল, যেন খুব বিপদে পড়ে কেউ ডাকছে, স্বরে আকুলতার ছাপ থাকলেও তার মধুরতা আমার, একবার ডাকতো, দুবার ডাকতো, তিনবারের সময় সেই মহিলা কণ্ঠ যেন আকুলতার সব বাঁধ ছাপিয়ে গেলো। প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে ছিলাম, কিন্তু সেই আকুল স্বর যেন অগ্রাহ্য করা যায় না। সেই স্বর আমার বুকে যেন ক্রমাগত করাঘাত করছে, সেই স্বরের মিষ্টতা যেন হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। আর থাকতে না পেরে মোহবশে দরজা খুলে আবার বাইরে গেলাম। কিন্তু কেউ তো নেই। কাউকেই দেখতে পেলাম না। সেই পুরোনো সুর, শব্দ, গন্ধ যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছে আমায়। কেমন যেন নেশাগ্রস্ত লাগছিল। চোখ যেন ঝাপসা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সামনের তেমাথায় মোড়ে কাউকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ছেলে না মেয়ে বোঝা গেলনা, যেন এক কালোছায়া মানব। আমার কপালে এখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে, একবার দুহাতে চোখ মুছে আবার ওদিকে তাকালে দেখলাম কেউ নেই। মনের ভুল ভেবে ঘরের দিকে ফিরি। যদিও জানি যে মন এতবার ভুল করতে পারে না। শোবার ঘরে ঢুকে শেষ বারের জন্য বাইরের দিকে আনমনে তাকাতে, আমার রক্ত হিম হয়ে গেল, হৃৎস্পন্দন ঘোড়ার বেগে ছুটছে। অন্ধকারেও যেন স্পষ্ট দেখলাম সামনের বাড়ির দোতলার ছাদের কার্নিশে এক মহিলা দাঁড়িয়ে, গায়ে

সাদা শাড়ি - লাল পাড়। গলায় ভর্তি গয়না, সিঁথি লাল সিঁদুরেলেপা। আমার অক্ষিগোলক তাঁর দিকেই স্থির। প্রায় এক মিনিট একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সামনে ঝাপ দিল। পড়ল সামনের বাড়ির একফালি উঠোন ছাড়িয়ে সামনের রাস্তায়। আমি আর দেখতে পারলাম না, সজোরে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। অচেতন হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেই মিষ্টি স্বরে কানে কানে কেউ বলল — ''শুভরাত্রি''।

তারপর আজ সকাল সাড়ে দশটায় মার ডাকে উঠে সব মনে পড়ে মাথাটা যেন নাগরদোলার মতো দুলে উঠে। মা সকাল সাতটা নাগাদ পিসির বাড়ি থেকে চলে এসে অনেক ডাকাডাকি করতেও আমি দরজা না খুললে, মা পিছনের দরজা অন্য চাবি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে দেখে আমি তখনও ঘুমাচ্ছি। মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমি আমার বিছানাতেই শুয়ে ছিলাম এবং বারান্দার দরজাও ভিতর দিয়ে বন্ধ ছিল। কিন্তু আমি যে কাল রাতে বারান্দায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তবে আমায় বিছানায় কে আনল? আমি নিজেকে প্রশ্ন করি ঃ ''স্বপ্ন দেখলাম নাকি''। না, ক্রমে সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফ্রেশ হয়ে উঠোনে গিয়ে দেখি সামনের রাস্তায় কিছু লোকের জটলা। পাঁচিলের গায়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম একটা কুকুর রাস্তার মাঝে কাত হয়ে পড়ে আছে। মুখে মাছি ভনভন করছে, গা রক্তাক্ত। রাণী!! আমি চিৎকার করে গেট খুলে রাস্তায় গেলাম। রাণীর রক্তাক্ত বিকৃত দেহ পড়ে, তাঁর চোখখোলা, চোখদ্বয় রক্তাক্ত যেন আতঙ্ক মিশ্রিত। আমি কিছু বুঝতে পারছিলামনা পাড়ার চার-পাঁচজন আমায় ধরে সান্তনা দিল, সবাই জানে রাণী আমার কাছে কী। আমার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছিল না, ইতি মধ্যে চিৎকার শুনে মা এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। বললো, ''তুই সহ্য করতে পারবি না বলেই বলতে চাইনি।'' আমার সামনেই আমাদের বাড়ির পিছনে এক কোনায় ওকে কবর দেওয়া হল। রাণী স্থির চোখ দুটো বারবার আমার মনে ভেসে উঠছিল। সেই চোখ দুটো যেন কিছু বলতে চেয়েছিল আমাকে। সবাই বলছে যে কোনো গাড়ির ধাক্কায় সে মারা গেছে কিন্তু আমার তা একেবারেই মনে হয়ে না। কাল ঠিক যেই জায়গায় ওই মহিলাকে পড়তে দেখেছি ঠিক সেই জায়গাতেই রাণীর মৃতদেহ পড়ে ছিল। এখন বুঝলাম সে কাল কেন সাড়া দেয়নি। শুধু তাই নয় বারান্দায় টেবিলের উপরের খবরের কাগজে একটা ছোট খবরও চোখে পড়ল, উত্তর-কলকাতায় বিয়ের দিন নববধূ বিবাহ সাজে আত্মঘাতী হয়েছে গতকাল। মৃত্যুর সময় রাত তিনটে। মৃত্যুর কারণ অজানা। তবে কী এই ঘটনাই আমি আমার বাড়ির সামনে দেখলাম! কিন্তু এ কী করে সম্ভব! এই ঘটনার সাথে আমার যোগ কী? রাণীর যোগ কী? কেন সে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু পেল!

আমার কাছে এর কোনোরূপ ব্যাখ্যা নেই। আমি নিজে অপ্রাকৃতে বিশ্বাসী নই। কিন্তু কাল রাতের ঘটনা আমি অস্বীকার করতে পারব না। আমার কানে কেবল বাজছে সেই মধুর মায়াময়ী স্বরে একটা কথা, ''শুভরাত্রি''।

''কোন বিষয়ে প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করিয়া ওঠা কঠিন।''

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Genuine Eerie Incident

Priyam Ghosh,
(Class - VIII, Section - A)

It is not an incident of long ago. It just occurred two or three days before. For my mother's order, I along with my sister went to a grocery shop to buy some essential commodities for daily use. After crossing a field and a graveyard, we could reach the shop. The evening was gradually falling. All around, it was veiled with the glowing moonlight. The sky was embellished with twinkling stars. On my way, I saw a woman standing beside a bury in the burial ground and she was weeping bitterly. Apart from her, I asked her, "Who are you and why are you crying?" It seemed that nature like me kept mum and was waiting for her reply. The surroundings began to be spooky. Then suddenly she spoke out, "Don't try to be acquainted with my reality. It may lead you to death. Finish the work you come to do and leave the place." But I sticked to my persistence and asked her again, "If you do not allow me to know your reality, I will not move an inch from here." Saying this, I tried to touch her but in vain. A miracle came off and my hand passed through her body. At once, I started to shiver in fear. But out of fear, I enquired, "Why can't I touch you?" In the meantime she stopped crying and burst out into laughter. She said, "Now can you made out who I am? Yes, I am a ghost." I said to myself, "Gosh! Till now I am talking with a phantom." It seemed I were senseless. The ghost continued her words, "I am Mita Roy. I was living in a house beside the nearby field. Being mourned with my husband's death fifteen days before, I breathed my last on last Tuesday. As I was nearly illiterate, I had my husband's fascination than that of my life." Saying this, she rotated her head towards me completely without any movement of body. Seeing this, I cried out, "Go far and please leave me and my sister." But my words completely mixed up in the air. There was a pond beside. There the shadow of the moon reflected and a scary scene was created around. Then she again started crying and said, "I was buried in the nearby graveyard. "As I have not yet completed a work on earth, I cannot set free from the infatuation of the earth and I immured here. If you help me, I will be very grateful. You are so valiant so, I think you proper for this job" said the ghost. I feared but asked what the work was and how I could help her. The woman gave me a chain and told me, "This chain is the last article. I have with me as the hallowed memories of my husband." I asked what was to do with that and a quick reply was got "You have to bury it with my husband's grave which is at a stone's throw

and this will give me salvation." My heart was moved with compassion, so I encouraged myself and went there. The graveyard was infested with buries and it was hard to recognize which was her husband's. Many buries were at sixes and sevens there and so she showed me and told where to bury. All around it was engulfed with only the shadow of darkness inside the burial area and it seemed that my every step took me towards the hell. But I made my works done and enquired her, "Why don't you do this your own?" In reply, I heard, "I cannot get in contact with any other's bury than mine." She hovered over the sky and was all praise for my courage and thanked me a lot. Saying this, she bade me goodbye and in the twinkling of my eyes, she merged into the air. Turning behind, I saw my sister lying on the ground and her body was reduced to be a cool ice in fear. In the meantime, my father has already arrived and become worried for my sister. I tried to explain the whole occurrence to him but he made laugh of that and he did not trust my single word. Then we came back home with father after buying the commodities from the shop. The justification may be incredible and funny for others. But only my sister and I were two eyewitnesses of the incident. It is said — "None but the sufferer knows his sufferings." As we saw it before our eyes, we knew it well that it was completely a gospel truth. This incident will be in my mind for years to come.

"Every home is a university and parents are the teachers."

— Mahatma Gandhi

Amazing facts of the Earth (Animal/Country)

Sreeparna Nandi,
(Class - VII, Sec. - Eng. Medium, Roll - 9)

◆ **Mystery Spot, Santa Cruz, California :**

The Mystery Spot in California is one of the many gravitational anomalies that you will find around the world. Discoveredf in 1939, this spot was opened to be public in 1940. Within the mystery area, you will be amazed to witness that the laws of gravity actually don't seem to work.

◆ **Bengali Speaking Country in Africa :**

Bengali is an official language in Africa's Sierra Leone. Bengali was announced as an official language in the West African nation of Sierra Leone to recognise the contributions of the Bangladeshi peacekeeping forces in the country's civil war.

◆ **Colour Changing Bird Surakav :**

The Surakav Bird or male Anna's Hummingbird is one of the most popularly searched birds on the internet. And the reason is obvious. Its amazing features makes ti more interesting than the rest. Internationally, the bird is sold for a whopping Rs. 25 lakh. The high price is because of the stunning effects of its features. These birds have thin features with clear keratin layers on the top of the fibers of the feature. So, when the rays of the sun fall on these features, some sunlight is reflected by the layer whereas some go through the layer and reflect the inner layer.

◆ **Interesting Pink Lake :**

Pink Lake is a salt lake in the Goldfields-Esperance region of Western Australia. Although historically the water inthe lake was visibly pink, as of 2017 it had not been pink for over ten years. Salt concentration s vital to Pink Lake's pink hue, and Pink Lake may turn pink again as conditions change. Hutt Lagoon's striking pink colour is thanks to algae that live in the water, Dunaliella salina. When exposed to sunlight, the algae produces beta-carotene, the red pigment found in carrots and other vegies.

◆ **Precious Whale Vomit :**

Ambergris also called ambergrease, or grey amber is whale vomit which is a sold, waxy and flammable substance and is dull grey or blackish in colour. However, it is believed to be passed either as spew or faeces. Why is it so valuable? Because it's used in the high-end fragrance industry. Ambergris was the main ingredient in a super-expensive, 200-year-old perfume originally made by Marie Antoinette.

◆ **Road of Human Bones :**

The R504 Kolyma Highway, part of M56

route, is a road through the Russian Far East. It connects Magadan with the town of Nizhny Bestyakh, located on the eastern bank of Lena River opposite Yakutsk. At Nizhny Bestyakh the Kolyma Highway connects to the Lena Highway. The route is known as the "road of bones", named after the thousands of gulag prisoners who died building it, their bodies buried just deneath its surface.

◆ **Isolated Island North Sentinel :**

North Sentinel Island is one of the Andaman Islands, an archipelago in the Bay of Bengal which also includes South Sentinel Island. It is home to the Sentinelese, an indigenous people in voluntary isolation who have defended, often by force, their protected isolation from the outside world. The place is so dangerous in fact that the Indian government has banned its peoples from going anywhere near it. Going within three miles of the island is actually illegal. ....Well the indigenous people who call the little bubbled utopia home, attack anyone who attempts to set foot on it.

◆ **Strange Country North Korea :**

The North Korean calendar is based on its founder's date of birth. It has only 3 TV channels. Electricity Power cut every night. Parents have to provide desks & chairs for their kids in school. Korean men can choose from a list of 28 hairstyles. Blue jeans are banned in the country.

Essay on Science and Technology

Shrijita Roy,
(Class - VI, Eng. Medium, Roll - 26)

Science and technology is the ultimate need of the hour that is changing the overall perspective of the human towards life. Over the centuries, there have been new inventions towards the field of science and technology that helps in modernizing. Right from connecting with people to using digital products, everything involves science and technology. In other words, it has made life easy and simple. Moreover, humans now have to live a simple life. There is modern equipment explored by tech experts to find something new for the future.

Science and technology have now expanded its wings to medical, educational, manufacturing and other areas. Moreover, they are not limited to cities, but also rural areas for educational purposes. Everyday new technologies keep coming making life easier and comfortable.

◆ **Brief about Science :**

Throughout history, science has come a long way. The evolution of the person is the contribution to science. Science helped humans to find vaccines, potions, medicines and scientific aids. Over the centuries, humans have faced many diseases and illness taking many lives. With the help of science, medicines are invented to bring down the effect or element of this illness.

◆ **Brief of Technology :**

The mobile, desktop or laptop which you are using for reading this essay, mobile you use for connectivity or communication or the smart technology which we use in our daily life, are a part of technology. From the machinery used in the factory to the robots created all fall under tech invention. In simpler words, technology has made life more comfortable.

Advancement in science and technology has changed the modern culture and the way we live our daily life.

Advantages and Disadvantages of Science and Technology

◆ **Advantages :**

Science and technology have changed this world. From TV to planes, cars to mobile, the list keeps on going how these two inventions have changed the world we see-through. For instance, the virtual talks we do use our mobile, which was not possible earlier. Similarly, there are electrical devices that have made life easier.

Furthermore, the transportation process we use has also seen the contribution of science and technology. We can reach our destination quickly to any part of the world.

Science and technology are not limited to this earth. It has now reached Mars. NASA and ISRO have used science and technology

to reach to the Mars. Both organizations have witnessed success in sending astronauts and technologies to explore life in the Mars.

◆ **Other Benefits :**

1. Life is much simpler with science and technology
2. Interaction is more comfortable and faster

3. Human is more sophisticated.

◆ **Disadvantages :**

With the progress in science and technology, we humans have become lazier. This is affecting the human mind and health. Moreover, several semi-automatic rifles are created using the latest technology, which takes maximum life. There is no doubt that the Third World War will be fought with missiles created using technology.

- Man has misused the tech and used it for destructive purposes.
- Man uses them to do illegal stuff.
- Technology such as a smartphone etc. hurts children.
- Terrorists use modern technology for damaging work.

◆ **Science and Technology in India :**

India is not behind when it comes to science and technology. Over the centuries, the country has witnessed reliable technology updates giving its people a better life. The Indian economy is widely boosted with science and technology in the field of astronomy, astrophysics, space exploration, nuclear power and more. India is becoming more innovative and progressive to improve the economic condition of the nation.

''পণ্ডিতদের মধ্যে একটি অদ্ভূত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন, যেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয়নি।''

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

X-পেরিমেন্ট

দেবাদিত্য রায়
(নবম শ্রেণী, বিভাগ - ক, রোল - ৪৬)

পুটুশ করে একটা মশা আমায় কামড়ালো। ধ্যুত্, চুলকাচ্ছে। এইদিকে মুড়ি খাইয়ে পোষ মানানো টিকটিকিটাকে একহাতে গ্লাভস পড়ে অন্য হাতে তুলি দেয়ে রং করছি। কোন হাত দিয়ে যে চুলকাই। ভগবানের কারসাজি, দু-একটা হাত বেশী দিলেও তো পারত আমার মতো হবু বিজ্ঞানীদের। উফ্, আর না। ঠাস্ করে কষালাম এক চড়। একি! চড় খাবার আগেই যে মশা বাবাজীর খেল 'প্রায়' খতম। কিন্তু টিকটিকিও যে পালালো। ''মা-আ-আ-আ, বিকেল হলে জানালাগুলো বন্ধ করো না কেন বলো তো! দিলে তো experiment টা ভন্ডুল করে।''এই ফাঁকে বলে নিই Asian paint এর plaster emulsion এর কী প্রতিক্রিয়া ঘরে থাকা টিকটিকির ওপর পড়ে, সেটাই হাতে কলমে, না না, গ্লাভস-তুলিতে দেখছিলাম। এদিকে পেটুক টিকটিকিটা মৃতপ্রায় মশাটাকে খেয়ে নিল। কোনো দয়ামায়া নেই দেখি এর ইতর জীবের। মশাটার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী বলে একটু দুঃখ হল। আবার ভালোও লাগলো। আমি দয়ালু বিজ্ঞানী। experiment এর নামে ইঁদুর, বাদুর, গিনিপিগ, বাদর মায় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া বড়ো বড় বিজ্ঞানীদের প্রতিভাবান বলা যায়, কিন্তু দয়ালু, নাঃ ঠিক বিশেষণ না। বিষয়টা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সভা থেকে online এ আলোচনা করে নিতে হবে। যাক্ টেবিলটা পরিষ্কার করে নি এইবেলা। একি! আমার পেটুক টিকটিকি এরকম এদিক ওদিক করছে কেন? (পাঁচ মিনিট পরে) যাঃ মরেই গেল? কেন? কিভাবে? আমি তো রং করছি শুধু লেজটা, বাকীটার আগেই তো পালালো। তবে কি — তবে কি, আমি যা ভাবছি, সেটা হয়নি তো?

গত ছয় মাস আগে খুব জ্বর শ্বাসকষ্টে ভুগেছি, করোনায়। মশাটা চড় খাবার আগেই চিত্পাত। আর মশাটাকে খেয়ে টিকটিকিও চিত্পাত। তা হলে কি সত্যি করোনা ধ্বংসকারী যে ওষুধটা বানিয়ে খেয়েছি আর বন্ধুরা যে বলছে এবছর আমিই 'নোবেল' এর দাবিদার, সেটা ভুল। আমার ঔষধ আমার অজান্তে প্রাণী হত্যাকারী কোনো বিষ তৈরী করেছে। না ....., এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। এ ভুল, এক মারাত্মক ভুল!

''এই হর্ষ! বলি এই হর্ষ। পুরোটা অংক ক্লাস বেঞ্চ-এ মাথা নামিয়ে ঘুমোলি, আর আমার বোর্ড ওয়ার্ক এর সময় ভুল ভুল বলে চ্যাঁচাচ্ছিস। আয়, এদিকে আয়। যদি আমার অংকটায় কী ভুল হয়েছে না দেখাতে পারিস, তবে ভুলে যাবো করোনার দূরত্ববিধি। আগে চড় মারব, তারপর হাত sanitize করব। যতো sanitizer লাগে লাগুক, কুছ পরোয়া নেই।''

'জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো
সর্বস্ব দিয়ে যাও আর কিছু চেয়ো না।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

দার্জিলিং ভ্রমণ

শুভদীপ্ত রায়
শ্রেণী - পঞ্চম, বিভাগ - খ, রোল - ৬৬

ভ্রমণ কথার অর্থ বেড়ানো, বেড়াতে সকলেই খুব ভালোবাসে। দীর্ঘ লকডাউনে সকলেই দীর্ঘদিন গৃহবন্দী ছিল। তাই লকডাউন ওঠার পরে অনেকের কাছেই বেড়ানোর নেশা চেপে ধরে। আমরাও সেই নেশার টানে বেড়িয়ে পরেছিলাম পাহাড়ের রাণী দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে।

জীবনে প্রথমবার। দার্জিলিং যাওয়ার আনন্দ। গত ২রা এপ্রিল ২০২১ তারিখের রাত ১০:০৫-এর দার্জিলিং মেল-এ আমাদের যাত্রা শুরু হয়। রাতে ট্রেনে খাওয়ার জন্য মা লুচি, আলুরদম ও ক্ষীর বানিয়ে নিয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার পর রাতের খাবার খাওয়ার পর আমরা যেযার জায়গায় শুয়ে পড়ি। আমি রাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা এপ্রিল সকাল ৮:০০টার সময় আমরা নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে গাড়িতে দার্জিলিং যেতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছিল। পথে গাড়ি থামিয়ে এক জায়গায় আমরা চা-জলখাবার খেয়েছিলাম। পথের সৌন্দর্য্য, দুপাশের সারি দেওয়া পাহাড়, পথের ধারের পাহাড়ি ফুল, বড়ো বড়ো ফার্ন গাছ — এসব সুন্দর দৃশ্য ঠিক আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছিল।

শিলিগুড়ি পার হয়ে যতই দার্জিলিং-এর দিকে এগোতে থাকি ততই শীত করতে আরম্ভ করল। দার্জিলিং-এ প্রায় সারা বছর ঠাণ্ডা থাকে। পথে যেতে যেতে আমরা টয়ট্রেনের দেখা পেলাম। খুব মজা হচ্ছিল, যখন দেখলাম আমাদের গাড়ি আর টয়ট্রেন একই রাস্তায় পাশাপাশি যাচ্ছে। এখানে আরো একটা জিনিস দেখে ভালো লাগলো সেটা হল আগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছেনা বা জোরে হর্ণ বাজাচ্ছে না, তারা নিয়ম মেনে সারিদিয়ে যাওয়া আসা করছে। তারপর যাওয়ার পথে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম পৃথিবীর উচ্চতম রেলওয়ে স্টেশন ঘুম স্টেশন।

প্রায় দুপুর বারোটার সময় আমরা আমাদের আগে থেকে বুক করে রাখা হোটেল ব্লু-বার্ডে পৌঁছালাম। হোটেলের জানালা দিয়ে পাহাড় দেখে আমার খুব মজা হচ্ছিল, দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আমরা আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখার জন্য বেড়িয়ে পড়েছিলাম। ম্যাল জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। যত রাত বাড়ছিলো তত ঠাণ্ডা বাড়ছিল। হোটেল ফিরে জানতে পেরেছিলাম দার্জিলিং শহরটা ৭১০০ ফুট উপরে অবস্থিত। সেইসময় ওখানে পাঁচ ডিগ্রী ঠাণ্ডা চলছিল। আমরা আরও জানতে পারি ওখানে যে জল সহজলভ্য নয়। তাই এখানে জল অপচয় করা নিষেধ।

পরের দিন বাবা একটি গাড়ি ভাড়া করে। যাতে করে আমরা প্রথমে পিসপ্যাগোডা দেখতে যাই। সেখানে অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি দেখতে পাই। সেখান থেকে আমরা রকগার্ডেন দেখতে যাই। সেখানে পাহাড়ের থেকে নেমে আসা ঝরণা, রংবেরং এর ফুল এসব মনোরম দৃশ্য দেখে আমার মন ভরে গেলো। তারপর সেখানথেকে বেরিয়ে হ্যাপিভ্যালি টি এস্টেটের চা বাগান ঘুরে উঁচু নিচু রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিলাম — পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে। এটি আসলে একটি চিড়িয়াখানা। এখানে বিভিন্ন ধরণের পশু-পাখি, সরীসৃপ দেখাগেল। তার ভিতরেই আছে একটি সুন্দর জাদুঘর ও পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এই জাদু ঘরের ভিতরে হিমালয় পর্বতমালার একটি মডেল আছে। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তেনজিং নোরগে থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্বতারোহীর ব্যবহৃত জিনিস ও মূর্তি এখানে রাখা আছে।

এরপর আমরা গিয়েছিলাম — তেনজিং রক-এ। সেখানে ঘুরে আমরা গিয়েছিলাম বাতাসিয়া লুপ-এ। এই জায়গাটা আমার ঘুব ভালো লেগেছে। এতো জায়গায় ঘোরার মাঝে মাঝে ছিল আমাদের ছবি তোলা আর খাওয়া। এরপর আমরা সেই দিনের মতো বেড়ানো শেষ করে হোটেলে ফিরে গেছিলাম।

পরের দিন সকাল ৯-টার সময় আমাদের যাত্রা শুরু

হয়েছিলো। আমরা প্রথমে গেছিলাম — অর্কিড গার্ডেনে। এখান বিভিন্ন ধরণের অর্কিড, রং বেরঙের ফুল ও মাছ দেখে মনটা ভরে গেছিলো। এখানে যাওয়ার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের গাড়ির ঠিক সমানে একটি Lays বোঝাই লরি যাচ্ছিলো। পাহাড়ি গাছে ধাক্কা লেগে একজায়গায় অনেকগুলো Lays এর প্যাকেট পড়ে গিয়েছিল। লরিটা না দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলো। আমাদের ড্রাইভার কাকু Lays গুলো কুড়িয়ে আমাদের দিয়েছিল।

এরপর আমরা সিকিম ভিউ পয়েন্ট দেখতে গিয়েছিলাম। এখান থেকে পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কুয়াশার জন্য আমরা কোনো জায়গা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি।

এরপর আমরা গেছিলাম তিস্তা ভ্যালিতে। এখানে তিনটি নদী মিশেছে। এই জায়গাটার আর এক নাম ত্রিবেণী। এখানকার কিছু রঙীন পাথর আমি কুড়িয়ে এনেছি। এরপর একটি চা বাগান ও কমলা লেবুর বাগান ঘুরে আমরা গেছিলাম লামাহাটা। এটি আসলে একটি পার্ক। এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেছিলাম।

পরের দিন আমাদের ফিরে আসার কথা। তাই মন খারাপ নিয়ে সন্ধ্যার দিকে আমরা কিছু কেনাকাটা করতে বেরোই। হঠাৎ পায়ের নীচটা কেঁপে ওঠে। সবাই দোড়াদৌড়ি করতে থাকে। আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। জানতে পারি ভূমিকম্প হচ্ছিলো। আমরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গেছিলাম।

পরের দিন সকালে মনখারাপ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে ছিলাম। ফেরার পথে মিরিক লেক ও গুড্‌রিক চা বাগান ঘুরে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছাই। আমাদের ট্রেন ছিল রাত্রি ৮ টার সময়।

এই কটি দিন দার্জিলিং ঘোরার পর আমি বুঝতে পারি এই শহরকে কেন পাহাড়ের রাণী বলা হয়। খারাপ আবহাওয়ার জন্য আমরা টাইগার হিলে যেতে পারিনি। কাঞ্চনজঙ্ঘা কোথাও থেকে দেখতে পাইনি। তবুই ছবির মতো সুন্দর এই শহরটিতে আমি আবারো বারেবারে যেতে চাই।

''মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা — এই হল শিক্ষার আদর্শ।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

রহস্যময় মিশর

প্লাবন বিশ্বাস

শ্রেণী - নবম, বিভাগ - ক, রোল - ৩৯

মিশর এক রহস্যপূর্ণ ঐতিহাসিক দেশ। এটি আফ্রিকা মহাদেশের লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল তীরবর্তী এবং এশিয়া মহাদেশের সীমানায় অবস্থিত। ৩০° দ্রাঘিমাংশ ও ২৫° অক্ষাংশ মধ্যবর্তী স্থান। এই দেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা প্রবাহিত হওয়ার কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলা হয়। সারা বছরই প্রচন্ড গরম। তাপমাত্রা ৪৫° সেলসিয়াস-এর উপর উঠে যায়। কিন্তু নীল নদ তীরবর্তী অঞ্চলগুলি সবুজ ঘাস দ্বারা, জঙ্গল, গাছপালাদ্বারা আবৃত। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, ইউরোপ মহাদেশ এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে লিবিয়া দেশ এবং দক্ষিণে সুদান দেশ অবস্থিত। মিশরের রাজধানী কায়রো হলো বাণিজ্যে ও অর্থনীতিতে উন্নতশীল এবং পোর্টসৈয়দ ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রতিবছর ইউরোপে নানান দ্রবাদি রপ্তানি হয় এবং আমদানি হয়। এই হলো মিশরের প্রাথমিক বর্তমান পরিচয়। চলো এবার যাওয়া যাক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে। এই সময় রাজা প্রজারা ছিল এইমানে। প্রজারা খুব গরীব ছিল। সে সময় উন্নত হয়নি এখনকার মতো। কোনো রোগ-ব্যাধি হলে মানুষ মারা যেত। তুতেনমামুন রাজা, রাণি ক্লিওপেট্রা শাসন করেছিলেন। এখানকার রহস্যময় অবাস্তব কিছু ঘটনা আছে যা চমকে ওঠার মতো! চলো জানা যাক সেই রহস্যময় জিনিসগুলি কী কী? প্রথম কথা পিরামিড এক রহস্যময় বস্তু যা বানানো হয় রাজা-রাণিদের কবর দেওয়ার পর তা আটকে রাখা হয়। এর আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি। এই পিরামিড বানানো হয় কয়েকলক্ষ ইট,পাথর ও কয়েককোটি শ্রমিকের সমবায়ে। একটা অদ্ভুত কথা আছে যা শুনলে অবাস্তব - ফালতু মনে হবে কিন্তু এটাই সত্যি। পিরামিডের এক একটা পাথরের ওজন ৮ টন! এই পাথর দ্বারা কীভাবে মানুষ তৈরী করল এই বিরাট বড়ো পিরামিড যা অদ্ভুত লাগে শুনলে! এর সাথে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও এলিয়েনের হাত আছে। এটা মানুষের এক কিংবদন্তী। কিন্তু এতো ভারী পাথর তুলল কী করে এটা বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছে। চলো এবার যাওয়া যাক পিরামিডের ভিতর। এর ভিতরের দেয়ালে আছে বহু বছরের পুরোনো চিত্র। সেখানকার সৈন্যদের ছবি। মাথাটা কুকুরের মতো এবং এক হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার আরো ভিতরে আছে মমি। রাজা বা তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তাকে ওষুধ-লাগানো কাপড় জড়িয়ে কবর দেওয়া হতো। একেই 'মমি' বলে। এগুলি দীর্ঘ বছর টিকে থাকে এবং নষ্ট হয় না। মিশরের লোকেরা ধর্মভীরু ছিল ও পুরোহিতদের খুব বিশ্বাস করত। পুরোহিতদের কথাও মেনে চলত। পরবর্তীকালে পুরোহিতরাই দেশের রাজা হলো। রাজাদের বলা হতো 'ফ্যারাও'। মিশরের লোকেরাই প্রথম চাষের জন্য নদী থেকে খাল কেটেছিল। মিশর দেশেই প্রথম নল-খাগড়ার তৈরী কাগজ আঠা আর ভূষো দিয়ে কালি তৈরী করে লেখা শুরু হয়। এই কাগজকে মিশরবাসী 'প্যাপিরাস' বলে। এই প্যাপিরাস কথাটি থেকে 'পেপার' কথাটির উৎপত্তি। এর থেকে বোঝা যায় প্রাচীন কাল থেকে মিশর সুসভ্য ছিল। একে বলা হয় 'মিশরীয় সভ্যতা'। এই মিশর নিয়ে পরবর্তীকালে নানান গবেষণা চলছে এবং বহু সিনেমা তৈরী হয়েছে।

সেই সময় : আমার আত্মজ

আশিস বৈদ্য, শিক্ষক

দ্রুম, দাম, ফট, ফটা-ফট আরও রকমারি শব্দে গভীর রাতের ঘুম জড়ানো চোখে কিছু বোঝার চেষ্টা। এই তো আবার — মনে হচ্ছে খু-উ-ব কাছেই। অশোক বিদ্যাপীঠ বা বাণীতীর্থ হাইস্কুলের মাঠে হয়তো! গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে রাধানগর, বাছুরডোবা, দহিজুড়ি কিম্বা কুশবনীর জঙ্গল থেকে। রাতের গভীরতার সাথে বোমা গুলির শব্দ যেন দূর থেকে আরও কাছে স্পষ্ট হতে থাকে।

ভাড়াবাড়ীর বিছানা ছেড়ে ঘুম জড়ানো চোখে সুইচ বোর্ড খুঁজছি। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ, মাষ্টার মশাই, ''লাইট জ্বালাবেন নি''। ''সেদিকের (ঐদিকে) জানালা খুলবেন নি''। প্রাক্ পূজাবকাশের এক সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশনে নেমেই অরণ্য শহর যেন এক অচেনা জনপদ মনে হল। পরিচিত রাস্তাঘাট, পাড়ার গলি পথ সব যেন পরিচয়হীন এক নিঝুম বসতি মাত্র। জনশূন্য রাস্তাঘাট, উধাও নগর জীবনের ব্যস্ততা। পুরুষ শূন্য পাড়া — যেখানে আমার অস্থায়ী ভাড়াবাড়ি। শুভাকাঙ্খী চেনা কিম্বা অল্প পরিচিতা মহিলাদের ভয় জড়ানো সতর্ক বার্তা 'মাষ্টার মশাই এখন না এলেই ভালো করতেন'। জানালা-দরজা বন্ধ ঘরের মেঝেয় বসে আলো বন্ধ করে মোমবাতির আলোতে রাতের খাবার খাওয়া — সে এক দুর্বিসহ প্রবাসী দিন যাপন। ভাড়াবাড়ীর ছাদে বিভিন্ন বয়সী প্রতিবেশী পুরুষদের রাত্রিযাপন, শঙ্কা একটাই এই বুঝি ওরা এসে পরে। কলম হাতে স্কুল পড়ুয়াদের সামনে শিক্ষক খুন, কর্মরত শিক্ষাকর্মীকে বিদ্যালয়ের গেটে পরপর গুলি, ঘুমন্ত সদ্য যুবকদের বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিচারের নামে অন্ধকারে কানে গুলি করে হত্যা — প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রতিদিনের শিরোনাম!

অবরুদ্ধ সড়কে পণ্য বোঝাই গাড়ির আগুনে ঝলসানো কঙ্কাল, রাস্তা কেটে গাছের ডাল ও গুঁড়ি ফেলে অবরোধ — দৃশ্য ছিল যেন চিরন্তন। অথচ জঙ্গলমহল ভীষণ শান্ত অতিথির আপ্যায়নে সদা প্রস্তুত একটি জনপদ। জঙ্গলমহলের রাজধানী অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম শাল - পিয়ালের মাঝে গড়ে ওঠা এক সবুজের সমারোহের প্রাণবন্ত শহর। রবীন্দ্রকানন, জঙ্গলখাস, রাজবাড়ি, চিলকীগড়ের ডুলুং নদীর ধারে কণকদুর্গা মন্দির পথিককে মুগ্ধ করবেই।

কংসাবতী নদীর উপর আমকলা — লালগড় সেতু লালগড় রাজবাড়ির আঙিনা স্পর্শ করে ঝিটকার জঙ্গল হয়ে মেদিনীপুরের দিকে ধাবমান। আবার ঝাড়গ্রাম — পুরুলিয়া রাজ্য সড়ক বেলপাহাড়ি — বাঁশপাহাড়ির ঢেউ খেলানো পথ অজস্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ডালা সাজিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত শাল, পিয়াল আর সোনাঝুড়ির জঙ্গল তপোবনের স্নিগ্ধতা নিয়ে নিশ্চুপ বিরাজমান। মহুয়া ফুলের মাদকতার সঙ্গে পলাশের রঙ্গিন উপস্থিতি বর্ণনাতীত সৌন্দর্য নিয়ে যেন রূপকথার রাজকুমারের প্রতিক্ষায়। আদিবাসী মহলার ধামশা — মাদলের গুড়ুম গুড়ুম ছন্দ হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়। শীতকালীন মুরগির লড়াই, ঝুমুর গানর আসর পথিককে দাঁড়াতে বাধ্য করে।

স্কুলের ছাদে দাঁড়িয়ে ধানের জমির আলপথ ধরে খালি পায়ে সারিবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে আসার দৃশ্য আজও স্মৃতির স্মরণিকায় স্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ওরা। কিন্তু মারাংবুরু একটি অকৃত্রিম হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য ওদের দান করেছেন। সদ্য সপ্তম উত্তীর্ণ সংক্রান্তি কিসকু, বা শিবানি মুর্মু যখন সকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বলে স্যার, ''মা - কে বলি দিবে, মোরে না বিহা দিতে। ঘরে টুকুম আসি বসি আছে হ।'' আশ্বাস দিয়েছি'' হারে, তুর কুনো ডর লাই, তুর মা - কে বুঝাই দিব, লে ইবার পড়াশুনাটা মন দে।'' জানিনা কার কাছে ওরা এই ভরসা পায় এখন? সদ্য বিবাহিত সীতা স্বামী রামচন্দ্রের সাথে চৌদ্দ বছর বনবাস যাপনের কথা কবি রামায়ণ মহাকাব্যে লিখেছেন। সীতা দেবী রূপে পূজিতা। একই আসরে সদ্য বিবাহিত আর এক নববধূ লক্ষ্মণ পত্নীর জন্য কবির কলমের কালি শুকিয়ে যায়। দেশ, সমাজ, জাতি এগিয়ে যাক। কিন্তু আমার সংক্রান্তি, শিবানী, ঈপিল, রিলামালা, সানকি যেন উপেক্ষিত না থাকে। ওরা যে আমাদের আত্মজ।

Play: A Samaritan

Subir Kr Saha, Assistant Teacher

Characters: Raju, Rimi (Raju's wife), Samar, Anju, Palash (Anju's husband), Nitin, GRP Officer, Soumi (teenage runaway), Soumi's parents, Tea stall owner, co-passengers, rogue

Act-1

Raju's Living Room (small unfurnished room, Raju waiting for tea after a nap, listening to a melodious song- *Jodi kagoje lekho nam*/ Manna Dey)

Raju: Samarda, oh Samarda! Are you home?... No response!

[Samar is busy reading a novel. He is very amiable but most of the time remains lost in his work. He is a writer. He looks through the window.]

Samar: Yes, Raju. Are you calling me?

Raju: How about taking tea with us this afternoon?

Samar: It would be nice. I am coming.

[Samar enters]

Raju: Please sit down.

Samar: Thank you. It is a mesmerizing song.

Raju: Have you gone through today's newspaper?

Samar: Yes. The situation in Kashmir is deteriorating. Again terrorist attack on pilgrims. When I remember our last year's pilgrimage to Amarnath shrine, I shudder.

[Rimi is an ideal housewife. Very hospitable. She comes in smiling with a tea tray in her hands.]

Rimi: Samarda, we are pleased to have you with us this afternoon. Palashda is coming too.

Samar: It is so kind of you to remember me.

Rimi: This cup is for you. I know you take tea without sugar.

Samar: Very good. You are so caring about me.

Raju: Do you like the flavor?

[Samar sips]

Samar: Of course. A distinctive flavor. Oh! tantalizing. Where do you buy the tea from?

Raju: From Berhampur. l often go there for business.

[Raju talks about an important issue.]

Well, this morning I was going to Kolkata. I was on the train. Two senior citizens were nostalgically talking about our beloved school. They mourned the demolition of the heritage building Roy Bahadur Hall. Can you remember it?

Samar: Yes, that two-and-half storey building in brick red. It is quite natural. We often feel nostalgic about our school days.

Raju: Nothing wrong. Many new things are coming to compensate for the loss of our heritage building- auditorium, lift, swimming pool, gymnasium smart class and so on. Safety concern is more important than a sentiment. The building was crumbling.

Samar: The present Headmaster is very energetic. He is a workaholic.

Raju: That is why our school is undergoing change beyond recognition. What about its academic achievement?

Samar: Last year it bagged 15 positions within the first 20 including the 3rd. Two years before that 3rd position in HS- that boy now doing MBBS course at Calcutta Medical College.

[Rimi is a graduate. She is worried about her child's education.]

Rimi: It is good to learn that English-medium section has started for HS Science. Is there any possibility of this section for class V? You are part of the management of the school. I think you can apprise us of the latest development.

[Raju's mobile rings. He stands up. Rimi exits.]

Raju: Just a minute. Hello, yes, Raju speaking.

Anju: I am your Anju Baudi speaking from Bandel.

Raju: Now you are at Bandel station ? Is there any problem?

Anju: Yes, I am coming back home with a teenage runaway.

Raju: Teenage runaway? Put me in the picture.

Anju: Listen. I was waiting at Burdwan Station with some of my co-commuters for the Bandel-bound Train. All of a sudden a seventeen-year old bride appeared before us with fear writ large on her face. A young man was suspiciously following her. We understood her predicament and put her under our protection. Give this message to your Palashda.

[Palash enters humming a tune.]

Raju: You are so late. Your tea is getting cold.

[Rimi enters.]

Rimi: Palashda, tea.

[Palash sips it.]

Is it ok?

Palash: It's ok.

Raju: Baudi just phoned me. She is returning home with a stranger, a seventeen-year old bride. She rescued her from a villain at Burdwan station.

[The news worries Palash. He grimaces.]

Rimi: Don't worry, Palashda. In this situation we should not lose our composure.

Palash: I fear she is going to face a lot of trouble. Disgusting! It is impudent of her to get entangled in the matter.

Raju: Don't look at the matter this way. It is her goodness, not an act of impudence to take trouble to save a live. What should she do, Samarda? What do you think? **[looks anxious, rubbing his chin.]**

Samar: She had better hand over the bride to the GRP.

Raju: At which station?

Palash: Let's know where the bride lives. Hello Anju, where does she live? ***[He phones Anju.]***

Anju: She lives at Debogram.

Palash: Have you got any contact number of her parents?

Anju: Yes, I have already contacted her parents over the phone. They are coming to Chakdaha by car.

Palash: It's wise of you. We shall wait for you at the station.

Samar: Let's get ready for the ordeal.

[Samar exits.]

Act-2

Scene - I

Chakdaha Railway Station, GRP Office

[busy railway station with stalls, passengers and a small unfurnished GRP Office, vendors (tea, chhola) giving their trade cries]

Attention please. 505121 Up Sealdah-Ranaghat Local is coming on platform number-1

Palash: Excuse me, any announcement of UP train?

Vendor: Yes. Ranaghat local.

[The train is in. Palash and Raju looking out for Anju. She gets off with Soumi sweating badly.]

Raju: Baudi, we are here!

Anju: Oh, a harrowing time throughout the day! I am distraught with the journey and the tension!

Palash: We should first give her some food. You take some as well. Let's go to the tea stall.

[They go to a tea stall.]

Samar: Look, over there Nitinda. Oh Nitinda!

[Nitin came in the same train.]

Nitin: Why are you all here?

Samar: Anju baudi has rescued a teenage runaway on her way back home from school.

Nitin: Really? Something strange! What exactly happened?

Anju: Wait. The whole incident will come clear to you a little later.

Nitin: The girl looks innocent.

Anju: She is not a girl! She is a bride.

Raju: It is a case of child marriage, isn't it?

Anju: Yes, you are right.

Palash: Now we can take her to the GRP.

[A small unfurnished GRP Office. The officer is a tall well-built young man, busy with some paper work. He is flanked by a woman officer.]

Anju: May we come in, sir? Sir, may we come in?

Officer: Yes, come in. What's the matter?

[A group of passengers crowed in front of the GRP office. The woman officer drives them away.

Woman Officer : Why are you crowding here? Go away.]

Officer : Yes, Madam.

Anju: Sir, I was waiting at Burdwan station. Some of my colleagues were with me. This teenager is a runaway. She is married. A young rascal was trying to lure her into a trap. We rescued her.

Scene - II

Burdwan Railway Station

[Train service is badly disrupted. The station is teeming with passengers and bustling with vendors' trade cries.]

Anju: The train will be terribly crowded. Today's train service is badly disrupted.

Co-passengers: Right you are. Beware of pickpockets. They will take advantage of the terrible rush.

Debjit: ***[cries Sneha]***

Debjit: Mam (Sneha) are you returning home from School?

Mam: Yes, Where are you going?

Debjit: I am going to Asansol, from there I shall go to Maithon.
Mam: On a tour?
Debjit: Yes, mam.
Mam: Have a nice time there.
Debjit: Thank you, mam. Bye.
Mam: Bye.
Anju: Last year our school went there, a beautiful place for excursion.
Antara: Are you going out on tour in Durga Puja?
Reya: Yes, going to Bangkok.
Antara: A popular tourist destination.
Reya: Now let's see Bangkok on Youtube.
[They are silently watching a video. Arpan waiting for the train, reading a magazine.]
Debaditya: Excuse me, you are Arpan .... Arpan Saha, aren't you?
Arpan: I ... can't remember you.
Debaditya: 1985 HS batch, Kanailal, Chandernagar.
Arpan: Yes, Yes. We meet after many years. How are you?
Debaditya: Fine.
Arpan: Your place of work?
Debaditya: TCS, Salt Lake. an electronic engineer. Your place of work?
Arpan: I am doing PhD in Biochemistry at Burdwan University. Your phoen number, please.
Debaditya: ..... Take my phone number .... Be in touch with me. Bye.
Arpan: Bye!

[Anju's attention goes to a teenager. She is sitting alone in a corner with a gloomy face. A boy who is her age hangs around. His motive is suspicious.]

Rogue: Are you alone? Where will you go? I would like to accompany you if you like.
Soumi: I do not know you. I do not like you. Why are you disturbing me? Shameless!
Rogue: No dear! I love you. How about going to a park nearby?
[Soumi feels vexed. She senses danger. She totters to a group of commuters for protection.]
Anju : Are you in trouble? Yes..... **[She hesitates.]** That guy ..... He is trying to lure me into a trap.
Anju: Where are you going?
Soumi: I do not know. This morning I ran away from my in-laws' place.
Anju: In-laws' place! Are you married?
Soumi: Yes I am. They tortured me regularly. Last night it turned unbearable. I do not find my life worth living.
Passengers: Calm down! Calm down! We understand your situation. Where do you live? Can you remember your father's phone number? What is his name?
Soumi: Debogram. My father is Dulal Biswas. Mobile Number .....
Anju: I am a school teacher. I have a daughter of your age. I live at Chakdaha. It is safe for you to accompany me. Will you go with me?

Announcement: 21122 Down Burdwan-Bandel local is coming on Platform-3

Anju: Look, the train is coming. Get ready, get ready.
[The train gets in. Anju and her colleagues get on with Soumi. They get down at Bandel. Her co-passengers also get off and say good bye.]

[Anju phones Soumi's father.]
Anju: Hello, are you Dulal Biswas?
Dulal: Yes, madam.
Anju: I am Anju Roy, a school teacher. Do you know that your daughter Soumi ran away from her in-laws' home this morning?
Dulal: No, no ! Not at all. **[The news shatters him.]** Where is she now? Please tell me, tell me.
Anju: I rescued her at Burdwan station. She is with me. I shall leave her in the custody of GRP, Chakdaha. You meet me there in the evening.
Dulal: Oh! God. Why this misfortune for me? *[He cries]*

Scene - III

(Chakdaha GRP Office)

Officer: Well, this case falls within the jurisdiction of Burdwan Station GRP. The incident happened at Burdwan. But why did you bring her over to my office? **[seems to be unwilling to deal with the case]**
Anju: Sir, listen. She lives at Debogram. I contacted her parents. They are coming by road. It would be convenient for them to meet us here. That's the reason.
Officer: What's your name? How old are you?
Soumi: I am Soumi. 17 years old. **[She looks panic-stricken]**
Officer: What is your husband?
Soumi: A labourer. Works under a mason.
Officer: Why did you run away from home?
Soumi: Sir, my husband, my in-laws- they all inflicted torture on me, sometimes physical and other times mental. Last night it turned unbearable.
Officer: Madam, your name please. What are you?
Anju: Anju Roy. A high school teacher at a Burdwan.
Officer: You cannot leave until her parents turn up. You take this piece of paper and write a brief report on what exactly happened. Address the report to the officer-in-charge, GRP, Chakdaha.
(Looking at Palash) Your relationship with the madam?
Palash: I am Palash Roy, her husband.
Officer: Palash! You are my namesake! Fine. **(Looking at Nitin and Raju)** What about you?
Nitin: We are her neighbours. I am a railway employee. **[answers smilingly]**
[Anju answers the phone call from Soumi's father.]
Anju: Hello, madam speaking from Chakdaha. Where are you now?
Soumi's Father: We are approaching Chakdaha Chowrasta. Are you at the GRP office?
Anju: Yes, I am. OK. Come over.
[She hands the report.]
Sir, here is the report.
Officer: Mention the time and put down your signature.
[Soumi's mother rushes to her in the GRP office to embrace her, but the woman officer stops her.]
Dulal: Excuse me sir, May we come in? [**Dulal is a day labourer in dire poverty.]**
Officer: Who are you?
Dulal: Our daughter, Soumi Biswas is in your custody. We are her parents.

Officer: Come in. I will put you behind bars. Why did you marry her off so early? Don't you know that child marriage is prohibited.?
Dulal: I was passing through hard times with three children to provide for. I am a day labourer. My son-in-law is not a bad fellow. He is the son of a close acquaintance of my friend. Honest and hard-working. His parents are also good. So we married her off.
Officer: Then what is the problem?
Parents: It is an adjustment problem.
Soumi: I was in class XI and they married me off. I was not ready for the marriage; it was against my will. I wished to receive education and stand on my feet. **[expresses grievance against her parents.]**
Officer: I understand your problem. Mr and Mrs Biswas, talk to your son-in-law and his parents and
settle the matter. But see to it that she continues with her studies.
[Anju points out Soumi's parents' folly.]
Anju: Excuse me, sir. Their argument is not acceptable. Now a lot of facilities are available for girl child's education. Kayashree Prakalpa is a unique initiative by the state government to help the girl child lead a more human existence. The project offers substantial financial support for girls. It aims at ending underage marriage. It echoes the Prime Minister's slogan: *Beti Bachao, Beti Padhao*
Parents: We are ashamed. We repent our folly. We shall send her to school. Words do not suffice to
express our gratitude to you. But for your kindness we would not get back our daughter. God bless you! **[looking at Anju]**
Anju: No, no. I have done nothing. Thank God. I am happy your daughter is returning home. Ensure that she lives with dignity.
Officer: Take her home and ensure that she lives happily.
Parents: Good night to all of you. **[with folded hands]**
Soumi: Good night to all of you. I seek your blessings. **[touching the elders' feet]**
Officer: Madam, I shall remember you. It is so noble of you to have taken pains for others.
Anju: Thank you and good night.

পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম। অপকর্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল।

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Co-rider

Debkumar Mandal, Assistant Teacher

Long ago on a full moon night I was going to meet one of my friends. I started at about 6:30 pm. Though it was a full moon night, the night was dark enough because it was cloudy. I took my umbrella and shawl with me. North wind blew hard. It was a mile's walk to the ferry ghat. On the way there was a river Rivu which I have to cross to reach Rituria, where my friend lived with his mother. At that time ferry services were available up to 7:30 pm. My friend's mother was severely ill. So he sought my help. She had got her leg broken and got severe pain. Dick, my friend, an electrical engineer, would be out of station on an urgent office duty for a couple of days. He requested me to stay with her for those days. She was an old lady of 65 years and with a lean feeble body. I immediately assured him.

We are friends since childhood. We read together from class five in Rituria High School. After HS dick went to study Electrical Engineering but I preferred Chemistry. Now I am settled in a college.

As I reached near the Rivu it started raining. The wind became harder. I opened my umbrella. It could not stop rain from drenching me. I wrapped myself with my shawl. Biting cold wind blew so hard that it seemed to sweep everything on its way. However I reached the ferryghat. It was almost a deserted place, only the boatman's hut was breaking the silence. I hurriedly pushed the door and entered the room. There was only one person waiting for the boatman covered with a shawl. It was a woman of about thirty-five. There was no electricity, only a kerosene lantern was burning. Strong wind accompanied by heavy shower created an un-natural whispering sound on the straw roof. The woman sat in one of the corners of a bench in dim room. I wait for a few moments. It seemed hours. Finally I decided to talk with her, 'Excuse me, where will you go?'

'Rituari', she answered feebly as if she was shivering in cold. She also informed that as she reached the ghat the boat had already left and she had been waiting since 6 pm. Then rain and wind began. It was 7:45 then. There was no trace of boat. We started speaking. She said, her name was Susan, and she lived by the Rituari Primary School. She was returning from her mother's home. She was the wife of the youngest son of the Mitras. She had gone to her father the day before and was returning from there. While talking I watched her very carefully. She was a tremendasly beautiful with two bright dark eyes. In the dim light of the room she looked extremely attractive in her navy-blue and green printed saree. She wore ear-rings. In the mean time rain stopped. The boatman returned with the boat. He called us. We boarded the boat and the boat started with us slowly. Gentle wind was blowing. The sky was about to be clear. Temperature had fallen a little bit. The boatman covered himself well with his cotton shawl. Only his nose and

eyes were discernable. As we reached half-way wind began to blow again. Gradually it became harder. Moonlit river glittered like the flow of diamonds. A wonderful song came feebly from a distance……

Bright blue moonlit sky
Deep dark water below,
We are on a boat,
That is silent and slow.
Deep dark water below.
O! Pilot, guide us now
On the way to Eternity!
Show the home in the Heaven
Place safely there our humanity.

All of a sudden the moon was covered with mist as a veil. Mist came down slowly and silently. It grew denser within a few moments. Yet the ivory reflection of the moon light was seen on the river water. But surprisingly on the boat it was hard to find anything beyond one foot. I only could see the shadow of Susan and the boatman. She was shivering in cold even if she was wrapped in shawl. She came and sat by me. A sudden wind blew off her shawl. ____ Splash ___. A loud sound of falling something heavy in the water was heard nearby. She was frightened. She caught tightly. She was trembling terribly and began to sweat in such a biting cold weather. I felt her warmth and excitement. I took her in my hands and wrapped her with my shawl. She said nothing and put her head resting on my shoulder. Wind blew harder and harder. The boat was tossing violently. Her hands tightened me gradually. My breath was going to be choked. I turned round to find the ferryman. Oh! Where was he? There was none with the steering; yet it moved forward. Then at times it moved smoothly in the turbulent water. I hardly could believe myself. I looked at my watch. It was 9:30 pm. Strange! Only five minutes ride to reach the other bank; already took half an hour. I was puzzled. What to do? What to do? I couldn't think.

I turned again. An almost inaudible whispering was heard. I looked around but found none. Fear began to haunt me. My hands grew colder. I could hear my own breathing. I was completely outwitted. I's waiting for the Rituari jetty to come. I tried to hold Susan tightly but what's it? I called her in a faint voice. Voice chocked. She did not respond. I called her again in shuddering voice and shook her. 'What is it?' I found a skeleton wrapped in the shawl. I shut my eyes in fear. Moments passed. I gathered courage and tried to get up to the steering, in vain. Eyes became drowsy. I could not see anything else.

I woke up as the bright sun shone on my face. Voice of crowd was heard. I found myself in the boatman's hut. They rescued me from the river side boat unconscious. The boatman enquired of my destination. I told him to leave me to Rituari. He sailed me to Rituari.

I reached my friend's house. After getting some refreshment I told Dick the incident of the previous night. He was absolutely astonished. He informed that Susan had died drowning in the Rivu in a boat capsize in the last full moon night. How strange? Who was with me then? Was it a dream or something else?

বাংলা তথা ভারতের শিল্প-সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সকল বাঙালি, তাদের মধ্যে ঠাকুর বাড়ির ছোট ছেলে, রবীন্দ্রনাথই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই! তারই পাশাপাশি আধুনিককালে গড়পারের রোডের রায়চৌধুরী বাড়ির মানিকের কথা না বললে বড় অন্যায় হবে। যদিও ভারতবাসীর আর্ন্তজাতিক পরিচয় রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, সত্যজিৎ, রবিশংকরের কাজের মধ্যেই অনেকখানি ধরা রয়েছে। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়টি আমরা এই আলোচনার বৃত্তের বাইরে রাখছি। আবার বিবেকানন্দ, গান্ধীজীর কাজের বিষয়টি অন্যরকমের — অন্যমাত্রার! অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বজয়ের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ, রবিশংকর, সত্যজিতের অনন্য সৃষ্টি মধ্যেই ধরা রয়েছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ আসলে দুটি সৃষ্টি ধারা প্রবাহ। আর কী আশ্চর্য সমাপতন! এই দুই মহীরুহের আর্বিভাব ঘটেছিল বৈশাখের খরতপ্ত রূপের আলোকচ্ছটায়! আদিকাল থেকে বাংলার আপামর জনগণের ক্ষুধা নিবারণের উৎস ছিল বৈশাখের প্রথম বারিধারা; তেমনি বাংলার মানুষের 'চিত্ত-প্রসাদ' বিতরণ করে চলেছে এই দুই সৃষ্টিধারা। গঙ্গা-যমুনার মিলিত প্রবাহের মত যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে, এই দুই সাংস্কৃতিক ধারা তেমনি অনন্তকালের বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্নরূপে বহমান থাকবে। আধুনিক শিল্প প্রকরণের বোধ হয় সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্র। সাহিত্য, চিত্রকলা, সর্বোপরি চলচ্চিত্রের শিল্পের মৌলিক ও অনুকরণীয় শিল্প সৃষ্টি দ্বারা, উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র সত্যজিতের মধ্য দিয়েই আধুনিককালে বাঙালির বিশ্বজয় ঘটেছে। তাঁরই হাত ধরে বিশ্ব-দরবারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছিল!

প্রাককথন :

ইতিহাস মতে, সত্যজিতের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল বিহারে। সেখান থেকে তারা নদীয়ার চাকদহ অঞ্চলের পাঁচনুরে বসবাস শুরু করেন। এরপর সুদূর ময়মনসিংহের মসূয়া

গ্রাম। পূর্বে তাদের পদবী ছিল দেব। রায়চৌধুরী এদের উপাধি। এই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন রামসুন্দর। তাঁরই উত্তরপুরুষ রামনারায়ণ। রামনারায়ণ মসুয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

অরণ্য-পর্বতময় প্রকৃতিতে মোড়া ময়মনসিংহ, রূপকথার দেশ যেন! ব্রহ্মপুত্র যমুনা সহ বহু নদ-নদী ঘেরা ময়মনসিংহ প্রাচীনকাল থেকে বহু কবি ও বিদগ্ধজনের জন্মদাত্রী। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস, গঙ্গারাম এবং মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ঃ যিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন; তারা সকলেই এই ময়মনসিংহের ভূমি-পুত্র-কন্যা। আবার 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব, অপরূপ প্রেমগাথা রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী পালাগুলি একথার স্বাক্ষর বহন করে। সে দিক থেকে ময়মনসিংহ যেন বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের আদি পীঠস্থান।

রামনারায়ণ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় তৎকালীন গ্রামজীবনেও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তারই বংশধর লোকনাথ। তিনি তন্ত্র সাধনা ও ধর্মকর্মে মেতে থাকতেন। তবে জ্ঞান চর্চা ও পাণ্ডিত্যে তিনিও অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। এই লোকনাথ হলেন উপেন্দ্রকিশোরের পিতামহ। লোকনাথের একমাত্র পুত্র কালীনাথও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কালীনাথের তিন কন্যা, আর পাঁচটি পুত্র। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন, মধ্যম কামদারঞ্জন, এরপর মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন এবং প্রমদারঞ্জন।

কালীনাথের এক অপুত্রক জ্ঞাতিভাই, হরিকিশোর রায়চৌধুরী তার মধ্যম পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক নিয়েছিলেন। আর নিজের নাম অনুসারে তাঁর নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর। পরবর্তীকালে অবশ্য হরিকিশোরের একটি পুত্র জন্মায় — নরেন্দ্র কিশোর।

উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বৃত্তিসহ পাশ করেন। জেলা স্কুলে পড়ার সময় তিনি ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অংকে ও সংগীতচর্চায় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কলেজে পড়ার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আসার পর উপেন্দ্রকিশোর আর ময়মনসিংহে ফিরে যাননি। হরিকিশোরের জমিদারির সম্পত্তির প্রতি তাঁর কোনদিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। এক যুগসন্ধিক্ষণে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থান, কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর, নবজাগরণ প্রসূতজ্ঞানালোকে নতুন প্রেরণা পেলেন — যার আলোকে তার অন্তর্নিহিত মেধা ও শিল্পসত্তা সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেল।

মনে করা হয়, উপেন্দ্রকিশোরই রায়চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ, যিনি উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথম কলকাতায় আসেন। একথা সঠিক নয়। উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সারদারঞ্জন তৎকালে একই সঙ্গে সংস্কৃত আর অংকে ডবল এম.এ. করেছিলেন। সারদারঞ্জন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে তিনি, ঢাকা কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে, কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে অভিহিত। সারদারঞ্জন পরে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদও সামলেছেন। সারদারঞ্জনের আরেকটি বড় গুণ ছিল তিনি শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় ছাত্রদের দক্ষ করে তুলতে চাইতেন। তিনি নিজে, অসাধারণ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। কেউ কেউ তাকে ''ভারতীয় ক্রিকেটের জনক'' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শক্তিশালী মজবুত চেহারার মানুষ ছিলেন। তাঁর ক্রিকেট খেলা ও শারীরিক সাদৃশ্যের কারণে তাকে ''ভারতের W.G. Grace" বলা হত। ডাবলু, জি. গ্রেস ছিলেন বৃটেনের বিখ্যাত ক্রিকেটার।

সারদারঞ্জনের কলকাতায় অধ্যাপনা করতে আসা, উপেন্দ্রেকিশোরের জীবনেও একটা প্রভাব ফেলেছিল। অগ্রজের পাশাপাশি, তিনিও কলকাতার সাংস্কৃতিক আবহে নিজেকে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সারদারঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যান্য ভাইয়েরাও লেখাপড়ার জন্য একে একে কলকাতায় চলে আসেন। পিতৃ বিয়োগের পর, সারদারঞ্জন সংসারের হাল ধরেন। বড়দাদার মত তার অন্যান্য ভাইয়েরাও ক্রিকেট অনুরাগী ছিলেন এবং সকলেই দক্ষ ক্রিকেটার হয়ে উঠেছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু উপেন্দ্রকিশোর। তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জনও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। অঙ্ক তার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। অংকের কঠিন কঠিন, নতুন নিয়ম উদ্‌ভাবন ছিল তাঁর অবসর বিনোদন। তবে তিনিও উৎসাহী খেলোয়াড় ও ব্যায়ামবীর ছিলেন। চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন, তিনিও ক্রিকেট খেলতেন। উপেন্দ্রকিশোর ছাড়া বাকি তিন ভাইয়ের ছিপ দিয়ে মাছ ধরার নেশা ছিল প্রবল। অর্থাৎ রায় পরিবরের এইসব সুশিক্ষিত পুরুষেরা খেলাধুলো এবং বাংলার অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকেও বড় পটু ছিলেন।

কুলদারঞ্জন প্রথম থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে

থাকতেন গড়পারের বাড়িতেই। তিনি ছোটদের জন্য কিছু বিখ্যাত ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। 'U. Roy & Sons' প্রকাশনায় তাঁর লেখা 'রবিনহুড', 'ইলিয়াড' পুরাণের গল্প, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ইনিই সত্যজিতের ধনদাদু।

পিতার মৃত্যুর পর ছোট্ট মানিক এই ধনদাদুর স্নেহ আদরে বড় হয়েছিলেন। ধনদাদুর আরেকটি বড় গুণ ছিল, তিনি কোন ব্যক্তির ছোট্ট পোট্রেট থেকে, অপূর্ব দক্ষতায় বড় করে ছবি আঁকতে পারতেন। ধনদাদুর ঘরে বসে, ছোট্ট মানিকের ফটো ফিনিশের কাজ দেখতে বড় ভাল লাগত। মানিকের জন্মের পূর্বে ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছিল। তাই ধনদাদুর সঙ্গে তাঁর বড় ভাব জমে ওঠে। দাদুর কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প ছাড়াও সে কুলদারঞ্জনের ক্রিকেটের গল্প শুনতে বড় ভালোবাসতো। গড়পারের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে, ছোট্ট মানিক মায়ের সঙ্গে ভবানীপুরে মামার বাড়িতে উঠে যায়। কিন্তু কুলদারঞ্জন এই পিতৃহারা নাতিটিকে বড় ভালোবাসতেন, তিনি ভবানীপুরে তাঁর মামার বাড়িতে গিয়েও তাকে গল্প শোনাতেন।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোটভাই প্রমদারঞ্জন 'সারভে অফ ইন্ডিয়ার' পদস্থ কর্মী হিসেবে ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে কাজ করেছেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, সাহসী, আর শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। শিবপুর বি.ই. কলেজ থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন। অসাধারণ কর্ম দক্ষতার জন্য তিনি উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। ভারত সরকার থেকে তিনি 'রায়বাহাদুর খেতাব' পান। জমি জরিপের কাজের, বিভিন্ন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। অরণ্য পর্বত, দুর্গম স্থানের গল্প বলায় তার জুড়ি মেলা ভার। দুর্গম স্থানে জমি জরিপের কাজে তাকে বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্রাজ্ঞী লীলা মজুমদার, এই প্রমদারঞ্জনেরই কন্যা।

সন্দেশের শুরু ঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকার সময়, উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময় তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করেন। ঠাকুরবাড়ির আধুনিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল উপেন্দ্রকিশোরকে বেশ আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, ঠাকুর পরিবার ও রায় পরিবার — উভয় বংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রসূত আধুনিকতায় সিঞ্চিত ছিল। তথাকথিত হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা বর্জন করে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই দুই পরিবারই ব্রাহ্ম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। তারা নিরাকার একেশ্বর ব্রহ্মের আরাধনাতেই তৃপ্তি পেতেন।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের একজন পৃষ্ঠপোষক, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর প্রথমা কন্যা বিধুমুখীকে উপেন্দ্রকিশোর বিবাহ করেন। এই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পত্নী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার। ইংল্যান্ড থেকে তিনি ডাক্তারিবিদ্যা অধ্যায়ন করে এসেছিলেন। সেকালের পক্ষে এমন অসাধারণ নারীর কথা ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে।

উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর ছয়টি সন্তান।

প্রথম সন্তান ঃ সুখলতা। কালে তিনি লেখিকা সুখলতা রাও নামে অধিক পরিচিতা!

দ্বিতীয় ঃ সুকুমার।

তৃতীয় ঃ পূণ্যলতা (তিনি পরবর্তীকালে সুলেখিকা হিসেবে পরিচিত হবেন। তার কন্যা নলিনী দাশ, যিনি জীবনানন্দ দাশের ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। তিনি সত্যজিৎ-কালে সন্দেশ পত্রিকার ছোট সম্পাদিকা ছিলেন।)

পরের সন্তান সুবিনয়, আর এক কন্যা শান্তিলতা এবং সকলের ছোট সুবিমল। (পরবর্তীকালে,এই সুবিনয় গড়পারের উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পরে সন্দেশ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে, আবারও ১৯৩১-৩২ খ্রিষ্টাব্দে সন্দেশ পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করেছিলেন)।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে বাস করতে থাকেন। এ বাড়ির একতলায় ছিল ''ইউ রায় এণ্ড সন্‌স'' এর ছাপাখানা। শিশু-কিশোর সাহিত্যে অপরিসীম অবদানের জন্য উপেন্দ্রকিশোরকে ''শিশু সাহিত্যের জনক'' ও বলা হয়। লৌকিক, রূপকথার গল্প সংগ্রহ করে, তিনি অন্যবদ্য ভাষায় 'টুনটুনির বই' রচনা করেন। ভারতীয় মহাকাব্যগুলির সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করার জন্য তিনি লেখেন 'ছোটোদের মহাভারত', 'ছেলেদের রামায়ণ'। 'গুপী গাইন-বাঘা বাইন', আকাশের কথা। তিনি ভূগোল ও আদিম প্রকৃতি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাধর, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, উপেন্দ্রকিশোর প্রচলিত

পদ্ধতিতে কখনো অংকন শেখেননি। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তিনি অপূর্ব সব ছবি আঁকতেন। জলরঙে, তেলরঙে কিংবা কালি-কলমেই তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর আঁকা হাফটোন ছবিগুলি অনেক সময় ফটোগ্রাফি বলে ভ্রম হয়।

উপেন্দ্রকিশোরই ভারতবর্ষের প্রথম হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং-এর প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। নিজের আঁকা ছবি ছাপতে গিয়ে উডক্যাট ব্লকের দ্বারা, তা ধ্যাবড়া হয়ে যেত। তাতে তাঁর ভীষণ মন খারাপ হতো। কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ তিনি নন। বিদেশ থেকে ছাপা বিষয়ে প্রামাণ্য বই সংগ্রহ করে, নিজেই অধ্যয়ন শুরু করেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, নিজেই উচ্চমানের 'হাফটোন' ছবি ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। প্রিন্টিং দুনিয়ায় উপেন্দ্রকিশোর উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি বিদেশেও পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশনা উপেন্দ্রকিশোরের সর্বশেষ ও সর্বাধিক কৃতিত্ব। বাংলার সাহিত্যজগতে হৈ হৈ পড়ে গেল। শিশু-কিশোরদের জন্য এমন সুদৃশ্য, রঙিন, সম্পূর্ণ পত্রিকা ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কল্পনা করাও যায়নি। প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ'-এর ভূমিকায় উপেন্দ্রকিশোর লিখলেন, সন্দেশ যেমন সংবাদ, তেমনি একটি মিষ্ঠান্নও বটে। এই মিষ্টান্ন যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। 'সন্দেশ' পত্রিকা পড়ে যদি আনন্দ হয়, আবার কিছু উপকারে আসে, তাহলেই এর নাম সার্থক। প্রকৃত অর্থেই তার দেওয়া 'সন্দেশ' নামটি বড়ই সর্থক হয়ে উঠেছিল। সেদিনের মাসিক 'সন্দেশে' থাকতো দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, নানা আবিষ্কারের কথা, সংগীত, ধাঁধা, ছড়া আরও হরেক রকম মনমুগ্ধকর বিষয়। সেদিনের সন্দেশ আজকের ডিজিটাল যুগের যেকোন পত্রিকার সঙ্গে লড়তে পারে বলে আমার বিশ্বাস!

সন্দেশের সুকুমার দিনগুলি ঃ

উপেন্দ্রকিশোরের সংসার এখন বহু শাখা-প্রশাখা, ফুলে-ফলে বিস্তৃত। তাই সুকিয়া স্ট্রিটের ছোট বাড়িতে তাঁদের আর সংকুলান হচ্ছিল না। নিজের মনমতো পরিকল্পনা করে, ১০০ নম্বর গড়পার রোডে প্রাসাদোপম, বড় বাড়িতে সপরিবারে তিনি উঠে আসেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতই পরবর্তীকালে এই বাড়ি হয়ে উঠবে, বাংলার শিল্প-সাহিত্য - সংস্কৃতির আর এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। উপেন্দ্রকিশোরের উদার শিক্ষা, এবাড়ির সন্তানদের শৈশব থেকেই উদারতা ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। তার মধ্যমকন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখেছেন — ''এ সংসারে কোনো খিল ছিল না, ছোট বড় সবাই মিলে খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদ, পড়ালেখা, ছবি আঁকা, গান বাজনার মধ্যে দিয়ে যে অখণ্ড সঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল, পূর্ণ পাত্র উপচিয়ে উঠে তা, পরিবারের অন্যান্য শাখাকে অভিষিক্ত করে গোটা (বাংলা) সমাজকে সিঞ্চিত করেছিল। .... সুকুমার রায় এই পরিবারে যে অদ্ভুত শিক্ষায় জন্ম নিয়েছিলেন, তার শীর্ষে ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাশালী উপেন্দ্রকিশোর। এঁর সংসারের কথা উপলব্ধি করতে পারলে, তবেই বুঝতে পারা যায়, অত অল্প বয়সে সুকুমারের সত্তার এত পরিপূর্ণ বিকাশ কি করে সম্ভব হয়েছিল।"

সুকুমারের প্রথম কবিতা 'নদী'। মাত্র ন-বছর বয়সেই ছোটদের পত্রিকা মুকুল-এ তা ছাপা হয়েছিল। মজার গল্প, ছড়া, কৌতুকে পারদর্শীদের নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সুকুমার 'নন্সেন্স ক্লাব' গড়েছিলেন। ক্লাবের পক্ষে প্রকাশিত হয় পত্রিকা — ''সাড়ে বত্রিশ ভাজা"। সম্পাদক সুকুমার রায়। তবে সকলের জন্যই এই ক্লাবের সদস্যপদ খোলা ছিল। তৎকালীন বাংলার বহু গুণী মানুষ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন — অতুলপ্রসাদ সেন, প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডা. দ্বিজেন মৈত্র, চিড়িয়াখানার অধিকর্তা বিজয় বসু, কিরণশঙ্কর রায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস নাগ — কে না থাকতেন এই সভায়! প্রতি সোমবার, ''ননসেন্স ক্লাবের" আসর বসতো। তাই পরে এর নাম পরিবর্তন করে হয় ''মনডে ক্লাব"। মনডে ক্লাবের আসরে ব্যাপক খাওয়া-দাওয়া এবং আনন্দ-মজার উপকরণ থাকতো। শেষে তার নাম হয়ে গেল ''মন্ডাক্লাব"। শিশির কুমার দত্ত ক্লাবের সম্পাদক। মাসিক চাঁদা চার আনা। সম্পাদক মাঝে মাঝে অন্য কোন কাজে কলকাতার বাইরে থাকতেন। সুকুমার সদস্যদের আমন্ত্রণ পত্রে লিখলেন —

''সম্পাদক বেয়াকুব / কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায় / ক্লাবটি তো যায় যায়।
তাই বলি, সোমবারে / মদ্ গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি / ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি

রকমারি পুঁথি কত / নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে / কিছু কিছু পাঠ হবে
করোজোড়ে বার বার / নিবেদিছে সুকুমার।

এমনই অপূর্ব তার রসবোধ, বাল্যকালেই যা পরিণতি পেয়েছিল। একবার স্কুলের জন্মদিনে ছাত্রদের খাওয়ানোর জন্য ড্রাম ভর্তি রসগোল্লা এনে রাখা হয়েছে। শিক্ষক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন — ''এইসব রসগোল্লা কে একলা খেতে পারে?'' বিরস বদনে সুকুমার বলেন — ''আমি পারি, এরপর নিচুস্বরে বলেন — ''তবে অনেকদিন ধরে''।

পরিবার ও অন্যান্যদের নিয়ে আনন্দ করবার জন্য, ''ঝালাপালা'' ও ''লক্ষণের শক্তিশেল'' নামক দুটি অসাধারণ কৌতুক নাটক এ সময় তিনি লিখেছিলেন। এই কৌতুক নাটকগুলি এখনো, যে কোন আধুনিক নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সুকুমার একসময় ''শব্দকল্পদ্রুম'' এবং ''চলচ্চিত্তচঞ্চরী'' নামক আরো দুটি নাটিকা লিখেছিলেন। তবে ''মনডে ক্লাব'' শুধু হালকা রসের পসারি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও পাশ্চত্য দার্শনিকদের গুরুগম্ভীর ভাবনা নিয়েও এখানে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলত।

সুকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা — দুই বিষয়ে অনার্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ''গুরু প্রসন্ন'' বৃত্তি নিয়ে তিনি ফটোগ্রাফি প্রিন্টিং বিষয়ে, অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ''ম্যানচেস্টার স্কুল অফ টেকনোলজি'' তে তিনি প্রিন্টিং টেকনোলজি অধ্যয়ন করেন। এই সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইংল্যান্ডে ছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে সুকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ তৈরি হয়েছিল। এ সময় ইংল্যান্ডের ''কোয়েস্ট'' পত্রিকায় সুকুমারের লেখা প্রবন্ধ "The spirit of Rabindranath" — সে দেশের পণ্ডিত মহলের নজর কেড়েছিল। ''লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে''র শিক্ষা শেষে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার ''লন্ডন রয়েল ফেটোগ্রাফিক সোসাইটি''র ''ফেলো '' হয়ে দেশে ফেরেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর উপেন্দ্রকিশোর মাত্র ৫৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। এবার ''সন্দেশ'' সম্পাদনা এবং ''ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'' প্রকাশনার দায়িত্ব এসে বর্তায়, বড় ছেলে সুকুমারের উপর। সহযোগী মেজভাই সুবিনয়। এই সুবিনয় রায় সুকুমারের অবর্তমানে ''সন্দেশ'' কে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সুকুমার ইতিপূর্বেও ''সন্দেশে'' লিখেছেন, এঁকেছেন; কিন্তু এখন থেকে ''সন্দেশ''ই তার দিবারাত্রির কর্মস্থল হয়ে উঠে। উপেন্দ্রকিশোরের হাতে তৈরি, সন্দেশে-র সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তিনি তা আরও উপভোগ্য করে তোলেন। ''সন্দেশ'' তখন বালক-বালিকাদের কাছে আরও আকর্ষণীয়, আরো মজাদার। জমকালো মলাট, সুকুমারের আঁকা মজার মজার ছবি, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সন্দেশ, সেজে উঠতো। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সন্দেশ সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। সত্যি বলতে কি মাত্র ৩৬ বছরের জীবনে, এই সময়টুকুতেই সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টির সুযোগ ঘটেছিল — আর তাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রায় শতাব্দীর শূন্যতা তিনি পূরণ করেছিলেন। তিনি আরেকটু দীর্ঘজীবী হলে, বাংলার সাহিত্য, শিল্প জগৎ অরো কতনা সমৃদ্ধ হতে পারত — এই আক্ষেপ বাঙালির চিরদিনের। ''খেয়াল রসের'' সম্রাট চিরবিদায় কালে বললেন —

''ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর / গানের পালা সাঙ্গ মোর!''

(প্রায় তিন দশক পর সত্যিজিতের হাত ধরে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ''সন্দেশ'' পত্রিকার যাত্রা আবার শুরু হয়েছিল। যুগ্ম সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। লীলা মজুমদারও কিছুকাল এ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে পিসতুতো দিদি নলিনী দাশ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সত্যজিতের কাজের সিংহভাগ তিনি দেখাশোনা করতেন। এই নলিনী দাশ ছিলেন সত্যজিতের নিনিদিদি।)

শৈশবের দিনগুলিতে মানিক ঃ

বৃটেনের পাঠ শেষ করে সুকুমার তখন সবে দেশে ফিরেছেন। সময়টা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। ঢাকার জগদীশচন্দ্র দাসের কন্যা বিদুষী, বুদ্ধিমতী, সুগায়িকা সুপ্রভার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। বিলেত যাবার আগে সুকুমারকে পাত্রী পছন্দ করে, রেখে যাবার কথা বলা হলেও কাউকেই তার পছন্দ হয়নি। ইতপূর্বে ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বাড়িতে কোন এক অর্ধ-পরিচিতার কণ্ঠের সঙ্গীত সুকুমারের কর্ণে ঝংকার সৃষ্টি করেছিল। সেই অদেখা গায়িকাটিই ছিলেন সুপ্রভা দেবী। কেবল সংগীত নয়, সুপ্রভার সমস্ত কাজ ছিল নিটোল, নিখুঁত। তা সে

রান্না হোক, বা সেলাই, চামড়ার কাজ, বা মাটির কোন কাজ — কোথাও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যেত না। এ বছরই কিছুকাল পরে মেজ ভাই সুবিনয়ের বিয়ে হয়েছিল, জব্বলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতার সঙ্গে।

সুকুমারের বিবাহের অনেকটা সময় পরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২ মে সুপ্রভার কোল আলো করে আবির্ভূত হলেন, ছোট্ট মানিক — বর্তমানের অস্কারজয়ী, ভারতরত্ন মহান সত্যজিৎ রায়। ইতিপূর্বে অবশ্য সুবিনয়ের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল ''ধন''। সেই নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুকুমারের পুত্রের নাম হল ''মানিক''। ''উদ্ভট রসে''র মহারাজা সুকুমার কখনো কখনো নিজের কাব্যভাষায় ছোট্ট মানিককে কোলে তুলে, এমনি করে আদর করতেন —

''ওরে আমার বাঁদর-নাচন, আদর-গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধ বনের গন্ধগোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে,
ওরে আমার গোবরগণেশ, ময়দা ঠাসা নাদুস রে
ছিঁচকাঁদুনে ফোকলা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে''

সত্যি বলতে বিকৃত মুখে, সুর করে এমন সব উদ্ভট শব্দের ছড়া শুনে কোন্ শিশু আর ছিঁচকাঁদুনে থাকে। — মানিক বরং তখন কলকলিয়ে হেসে উঠেছে!

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২মে মানিকের দুই বছর পূর্ণ হয়। ভয়ঙ্কর কালাজ্বরের প্রভাবে সুকুমার তখন বেশ অসুস্থ। ছোট্ট, অথচ আন্তরিক এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মানিকের নামকরণ করা হয় সত্যজিৎ। উপেন্দ্রকিশোরের পরের ভাই মুক্তিদারঞ্জন তার বাড়ি থেকে অনেকগুলি সুন্দর ''ডালা'' সাজিয়ে মানিকের জন্মদিন উপলক্ষে গড়পারের বাড়িতে এসেছিলেন। মনোরম আলপনায় ভরা ছোট্টপিড়িতে লেখা — ''সত্যজিৎ বসবে''। জরি পাড় ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাজানো ডালায় লেখা — 'সত্যজিৎ পরবে''। ঘরে তৈরি নানা মিষ্টির থালায় লেখা — ''সত্যজিৎ খাবে''। এমনি কত মধুর স্মৃতিতে ভরে থাকতো সেদিনের গড়পারের রায়বাড়ি। এই মুক্তিদারঞ্জনই ছিলেন রায়বাড়ির ছোটদের সুন্দরদাদু। নামকরণ অনুষ্ঠানে মানিক অনেকের থেকে অনেক রকম উপহার পেয়েছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাকে দুটি ছোট্ট গ্রামফোন উপহার দিয়েছিলেন। তাতে বেশিরভাগই ইংরেজি গানের রেকর্ড ছিল কিন্তু একটি বাংলা গান ছিল — ডি.এল. রায়ের লেখা।

তখন কালাজ্বরের তেমন ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। দুরারোগ্য ব্যাধি উপশমের জন্য ডাক্তাররা সুকুমারকে হাওয়া পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। সকলে দার্জিলিং যাওয়ার পথে প্লাটফর্মে সুপ্রভাদেবী ভিক্ষুককে দুটো খুচরো পয়সা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তাতে খুশি নন, আরো চাই, নাছোড়বান্দা। তখন মায়ের কোলের কাছে রাখা ব্যাগের সমস্ত খুচরো পয়সা ছোট্ট মানিক ভিখারির কোলের উপর উপুড় করে দিয়েছিল। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাতে কতটা খুশি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু তাতে মানিকের খুশি আর ধরে না!

মানিকের মেজ পিসেমশাই, অরুননাথ চক্রবর্তী বিহার ক্যাডারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই সূত্রে তাকে বিহারের বিভিন্ন মফস্বল শহরে বদলির চাকরি করতে হয়েছে। কখনো গিরিডি, কখনো রাঁচি, হাজারীবাগ, দ্বারভাঙ্গা, কখনো অন্য কোন ছোট শহরে। তিনি সুলেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্বামী এবং পরবর্তী যুগে ''সন্দেশে''র ছোট সম্পাদিকা নলিনী দাসের (নিনি দিদি) পিতা। তিনি হাজারীবাগ কিংবা গিরিডিতে থাকার সময়, পিতার মৃত্যুর পর ছোট্ট মানিক মায়ের সঙ্গে অনেকবার ছুটিতে সেখানে বেড়াতে গিয়েছে। এই সময়ের বর্ণনায় নলিনী দাশ লিখেছেন — ''আমরা উশ্রী নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম, সন্ধ্যা হলে তবে ফিরতাম, গরমের দিনে তখন নদীতে একেবারেই জল ছিল না। আমরা মনের আনন্দে বালিতে খেলা করতাম। মানিকের সঙ্গে মামিমাও এই খেলায় যোগ দিতেন। অনেকদিন পরে মামীমাকে সহজ স্বাভাবিকভাবে কিছু করতে দেখে আমাদের খুব ভালো লাগতো। ... খুব উৎসাহের সঙ্গে মানিক বালি খুড়তো, আর পাহাড় বানাত। একবার মানিকের, আর আমার পাহাড়ের একটা দিক ভেঙে মামিমার কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। আমাদের সে কি উত্তেজনা!''

পিসিমা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর বাড়িতে পিসতুতো দাদা-দিদিদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের মজাদার খেলায় মানিক মেতে উঠতো। তাদের একটা খেলা ছিল —

হনলুলু প্যা প্যা, প্যা প্যা''।
এখানে,
প্রথমজন বলবে — হনলুলু বাদাম ভাজা
দ্বিতীয় জন — হললুলু জিভে গজা
তৃতীয় জন — হনলুলু মজা মজা
শেষ ব্যক্তি — হনলুলু প্যা প্যা প্যা প্যা।

ধারাবাহিক, অর্থহীন এইসব ছন্দে, হয়তো শিশুমন পুলকিত হত।

আর একটা খেলা ছিল গল্পলেখা। প্রথম খেলুড়ে, গল্পের একটা নাম দেবে, আর দেড় লাইন লিখে, প্রথম লাইনটা মুড়ে সেই কাগজটা সে দ্বিতীয় খেলুড়েকে দেবে। দ্বিতীয় খেলুড়ে ওই আধ লাইন পুরো করে, আরও দেড় লাইন লিখে একইরকম ভাবে তৃতীয়জনকে দেবে। এমনিভাবে যতক্ষণ না গল্পলেখা শেষ হয়, ততক্ষণ ওই ভাঁজ করা কাগজ সকলের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। শেষমেষ গল্পের যে কী রূপ দাঁড়াতো তা আমরা বুঝতেই পারছি। এমনিভাবে আরো কত মজার মজার খেলা, তারা নিজেরাই তৈরি করত। তবুও এইসব ভাবনায় সেকালের কিশোর-কিশোরীদের মনে এক অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি হতো, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের ডিজিটাল যুগের শিশুদের হরেক রকম মজাদার উপাদান দিয়েও হয়তো, তাদের মনে সেই নির্মল আনন্দ সৃষ্টি সম্ভব নয়। ছোট্ট সত্যজিৎকে মজা দেওয়ার জন্য পিসিমার বাড়িতে শীতকালে ''ফাদার ক্রিসমাস'' সেজে এক নতুন খেলা চালু হয়েছিল। নিনিদিদির খুড়তুতো দাদা, কল্যাণ চক্রবর্তী লালটুপি, মুখে সাদাদাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে পিঠে একটা উপহারের থলি নিয়ে গভীর রাত্রে সবার শিয়রে একটা করে উপহার রেখে আসতেন। অন্যদের সামান্য উপহার থাকলেও মানিকের জন্য পিসি পুণ্যলতা বিশেষ উপহারের ব্যবস্থা রাখতেন। আবার পুজোর সময় পিসি উপহার কেনার জন্য টাকা পাঠাতেন। মানিক সেই টাকা দিয়ে, কী কী ভালো বই কিনল তা চিঠিতে পিসিমনিকে জানাতো।

ইতিমধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিসেমশাই দ্বারভাঙ্গা বদলি হয়েছেন। ছুটিতে মানিকও মায়ের সঙ্গে সেখানে হাজির। এ বাড়ির সবাই প্রায় তার থেকে বড়। তার বয়স তখন ৫/৬ বছর হবে। তার থেকে ৫ বছরের বড় পিসতুতো দিদিরা তার খেলার সঙ্গী। খেলা হতো ডাক্তার ডাক্তার। দিদিরা রোগী হত। মানিক ডাক্তার, ইনজেকশন, ওষুধ দিলে নকল রোগীরা দ্রুত সেরে উঠত। খালি ক্যাপসুলের খোলের মধ্যে ময়দার পুর দিয়ে বড়ি তৈরি করা হতো। দিদিরা একদিন এক মস্ত ডাক্তারের প্যাড তৈরি করল। ডক্টর সত্যজিৎ রায়, এমডি., এফ.আর.সি.এস., এম.আর.সি.পি। দিদিরা বলল — তুই মস্ত বড় ডাক্তার, আমাদের চিকিৎসা কর। মানিক বেঁকে বসল — ''আমি তো ডাক্তার হব না। আমি জার্মানি গিয়ে সিনেমা তৈরি শিখে এসে সিনেমা বানাবো।'' বালকের মনে এই ভাব কিভাবে উদয় হয়েছিল আমরা জানিনা। তবে ইতিমধ্যে মানিক অনেকগুলো ভালো সিনেমা দেখেছিল।

বয়সে বড় খেলার সাথীদের থেকে সে অনেক ছোট হলেও, গল্প লেখা, ছড়া বলা, ছবি আঁকাতে, সে সকলের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতো। ১০ বছর বয়সেই মানিক চমৎকার ছবি তুলতে পারত। পিসিমার বাড়িতে পিকনিক করতে এসে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলা, কিংবা পিকনিকের দলের ছবি তোলায়, সে ছিল অদ্বিতীয়। ওই বয়সেই সঠিক অ্যাঙ্গেল ধরবার জন্যে, সে দুর্গম স্থানে চলে যেত। তা সে একেবারে জলপ্রপাতের ধারে হোক কিংবা খাড়া পাহাড়ের ঢালে। কুনা নদীর হাঁটুজলে দিদিদের এমনভাবে গলা ডুবিয়ে বসতে বলে, ছবি তুলেছিল, যেন মনে হচ্ছিল তারা সাঁতার কাটছে। কিছুকাল পরেই বৃটেনের বিখ্যাত পত্রিকা "boys won paper", মানিককে প্রথম পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল।

মামাবাড়িতে ঃ

সুকুমারের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই গড়পারের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। মানিকের বয়স তখন সাড়ে পাঁচ বছর। মানিক, মা সুপ্রভাদেবীর হাত ধরে ভবানীপুরের বকুলবাগানে সোনামামা, প্রশান্তকুমার দাশের বাড়িতে উঠে এলো। প্রশান্ত কুমার দাশ ছিলেন সুপ্রভা দেবীর তৃতীয় ভাই। এখানেই মানিকের এক মাসী — কনক দাশ ছিলেন, গায়িকা হিসেবে যার সুনাম হয়েছিল। কনক বিশ্বাস নামে তার কিছু রেকর্ডও বেরিয়েছিল একসময়। মামাবাড়িতে গান-বাজনার রীতিমতো চর্চা ছিল। সে কারণে বালক বয়সেই গান বাজনার প্রতি মানিকের একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

সোনামামা আপাত গম্ভীর হলেও, ভারী আমুদে ব্যক্তি ছিলেন। ছেলে-মেয়ে, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের নিয়ে তিনি হইচই করে সিনেমা দেখা, ম্যাজিক দেখা, সার্কাস দেখা — এসবে বড় উৎসাহ দেখাতেন। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা মানিকের সমবয়সী কেউ ছিলনা। তাই সে যাতে একাকিত্ব বোধ না করে সে কথা ভেবে মেজ পিসিমনি তাকে দশ খন্ডে "book of knowledge" কিনে দিয়েছিলেন। সঙ্গে চার খণ্ড "the romance of famous lives". পূণ্যলতা দেবী তাঁর আদরের

ভাইপোটিকে আরো বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ সমবয়সী বালক-বালিকাদের থেকে মানিকের মন অনেক বেশি পরিণত মন হয়ে উঠেছিল। অতিরিক্ত আদর-আহ্লাদ কিংবা নিষ্ঠুর শাসন ছাড়াই মামাবাড়িতে, মায়ের তত্ত্বাবধানে মানিকের জীবন একটা সুশৃংখল নিয়মেই বেড়ে উঠছিল।

সাড়ে ৮ বছরের মানিককে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে, প্রথম বালিগঞ্জ গর্ভমেন্ট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। ইতিপূর্বে সে বাড়িতেই মায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। একটু বেশি বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও স্কুল তার ভাল লেগেছিল। তার আঁকার হাত অত্যন্ত ভালো থাকায়, স্কুলের পেইন্টিং শিক্ষকের সে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। পড়াশুনার প্রতি যথেষ্টই তাঁর আগ্রহ ছিল কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফলের ব্যাপারে সে বড় উদাসীন ছিল। যদিও স্কুলের পরীক্ষা শেষে বরাবরই প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে এসেছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি অনার্সের পাঠ শুরু। কলেজে পিতৃবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সান্নিধ্য পেয়েছেন। মা চেয়েছিলেন বাবা-ঠাকুরদার মতো মানিকও প্রেসিডেন্সিতে পড়ুক। আবার অন্যদিকে তখন শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে শান্তিনিকেতন সারা ভারত তথা বিশ্বের কলা-প্রেমী মানুষদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

প্রথমবার শান্তিনিকেতনে ঃ

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে রায় পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের গভীর সংযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সুকুমারকে অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। কালাজ্বরে পীড়িত সুকুমারের মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কয়েকবার। শেষবার ১৯২৩ সালের ২৯ আগস্ট। বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে কবি সুকুমারকে কয়েকটি গান শুনিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সুকুমার অনন্তলোকে যাত্রা করেন। এই সুকুমারের পুত্র সত্যজিতকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন।

মানিকের ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন লম্বা চুলের রবীন্দ্রনাথের কেশবিন্যাসকে, মেয়েলি বলে ব্যঙ্গ করতেন। তার মতে পুরুষ মানুষের চুল হবে ছোট ছোট। তাই শৈশবে মেয়েলি চুলের রবীন্দ্রনাথকে, মানিক ততটা পছন্দ করত না। সেবার মানিকের যখন বছর দশেক বয়স, সুপ্রভা এলেন ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায়। মানিকের নেশা ছিল বিখ্যাতদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা। হাতে নতুন কেনা অটোগ্রাফ খাতা। সুপ্রভা এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। এখন একটু পরিণত বয়সে সে মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল এই দাড়িওয়ালা লম্বা চুলের মানুষটার জগৎজোড়া খ্যাতি। আর তিনি তাঁর বাবাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তা শুনে সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে অটোগ্রাফের খাতায় এমন বিশ্বজয়ী কবিকে দিয়ে যদি, একটা কবিতা লিখে নেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তখন মেধা ও খ্যাতির শুকতারা হয়ে উঠেছেন। উত্তরায়ণের একটি ঘরে বইপত্রের মধ্যে বসে আছেন, প্রসন্ন কবি। অভিভূত মানিক! সত্যজিতের ভাষায় — ''খাতাটা দিতে, বললেন'', এটা থাক আমার কাছে, কাল সকালে নিয়ে যেও।'' কথামতো গেলাম পরের দিন। টেবিলের উপর চিঠিপত্র খাতা বইয়ের ঠাঁই। তার পিছনে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আর আমায় দেখেই আমার ছোট্ট বেগুনি খাতাটা খুঁজতে লেগেছেন, সেই ভিড়ের মধ্যে। মিনিট তিনেক হাতড়োনোর পর বেরল খাতাটা। সেটা আমায় দিয়ে মা-র দিকে চেয়ে বললেন, ''এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে''। খাতা খুলে পড়ে দেখি আটলাইনের কবিতা, যেটা আজ অনেকেরই জানা ....।

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

কথিত আছে, সুর সম্রাট মোৎসার্ট খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান কালে কিশোর বিঠোফেনকে নজরে রাখতে বলেছিলেন। কি আশ্চর্য যোগ! রবীন্দ্রনাথও কি সত্যজিতের উদ্দেশ্যে এমন কথা বলেছিলেন। তাই কি সত্যজিৎ পরিণত বয়সে শতাধিক বিদেশি সিনেমার কাহিনী, অভিনয়, টেকনিকে আকৃষ্ট হলেও একান্ত মৌলিকতায় তাঁর সৃষ্টিতে বাংলার মেঠো সুরের ''পথের পাঁচালী'' কে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

আবার শান্তিনিকেতন ঃ

সুকুমারের পুত্র বলেই কি সত্যজিতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল। কাছে রাখার মৃদু বাসনা ছিল। সত্যজিৎ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে বি.এ. পাস করেন। মা সুপ্রভা দেবীর ইচ্ছা ছিল মানিক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করুক। মায়ের ইচ্ছা ও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে কলাভবনে ভর্তি হলেন। নন্দলাল বসু কলাভবনের প্রধান। এমন মানুষকেই তো সত্যজিৎ চাইছিলেন। অঙ্কন শিল্পে তাঁর অভাবনীয় উন্নতিতে স্বয়ং নন্দলাল বিস্মিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় সিনেমার সম্রাট কিন্তু কখনও শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হননি। বরং বেটোফেন, মোৎসার্ট শুনে অবসর যাপন করেছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতই তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৪১ এ গুরুদেবের প্রয়াণের পর সত্যজিতের আর শান্তিনিকেতনে মন টেকেনি। কলাভবনের পাঠ শেষ করে, মাত্র একবছর পরেই কলকাতায় ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন বন্ধুর সাথে ভ্রমণে বেরিয়ে, ভারতের বিভিন্ন চিত্র ও ভাস্কর্য — এলিফ্যান্টা গুহা চিত্র,আর অজন্তা ইলোরা, খাজুরাহো তাঁর শিল্প দৃষ্টিকে আরো প্রখর করে তুলল। ১৯৪২শে শান্তিনিকেতনের পর্ব সমাপ্ত।

কাজের খোঁজে ঃ

কলাভবনে অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সত্যজিৎ প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। এদিকে, সুকুমারের মৃত্যুর পর সুপ্রভা দেবী বহু কষ্ট ও নিষ্ঠায় একমাত্র পুত্র মানিককে মানুষ করেছেন। সংসারের হাল একাই টেনেছেন। এবার মাকে সংসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, অনভিজ্ঞ মানিককে সহজে কেউ কাজ দিতে চায়নি। কয়েক মাস পরে ১৯৪৩ খ্রিস্টব্দে ইংরেজ মালিকানার বিজ্ঞাপন সংস্থা ''ডি.জি. কীমারে'' কাজ জুটলো। মাহিনা মাত্র ৮৫ টাকা। তাঁর কাজ হল, নতুন বইয়ের মলাটে ইলাস্ট্রেশন করা। কিছুদিনে র মধ্যে কিমার-এর কর্তারা সত্যজিতের কাজে খুশি হন। অল্প দিনেই তাঁর পদোন্নতি ঘটল। ইতিমধ্যে তাঁর কাজের খ্যাতিও খানিকটা ছাড়ায়। সিগনেট প্রেস থেকেও তাঁকে কাজ করবার জন্য ডাকা হয়। একই সঙ্গে দুটি সংস্থায় কাজ করায় কোন বাধা ছিল না। প্রায় দশ বছর দক্ষতার সঙ্গে ডি. জে. কীমারে কাজ করেছিলেন। সত্যজিতের কাজের খ্যাতি ইংল্যান্ডেও পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে কোম্পানি তাঁকে প্রমোশন দিয়ে লন্ডন অফিসে বদলি করে, আর্ট ডিরেক্টরের পদে। উল্লেখ্য এ সময় বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় এসেছিলেন। ইচ্ছা এখানে তার "The River" ছবির শুটিং করবেন। ''সিনে ক্লাবে''র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে, সত্যজিৎ ভয়ে ভয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মুভি পত্রিকা ''সিকোয়েন্সে'' তাদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্ভাবনের মৌলিকতায় ঃ

প্রচ্ছদ শিল্পে নূতনত্ব —

এসময় সত্যজিৎ মূলত ছিলেন প্রচ্ছদ শিল্পী। তরুণ সত্যজিৎ বিভিন্ন বইয়র বিভিন্ন রকমের প্রচ্ছদ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ''পাগলা দাশু'', ''ঝালাফালা'', ''খাই খাই'' — সুকুমারের লেখা এই সব বইয়ে সত্যজিতের আঁকা মলাটে বাঙালি বিস্মিত। তাঁর আগে কোনো শিল্পী এভাবে ভাবেন নি। স্টাইলের বৈচিত্র ছিল সত্যজিতের প্রচ্ছদ অংকনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুকুমারের বইয়ে তিনি যেভাবে প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন, জীবনানন্দের গ্রন্থে অবশ্যই সেই আঙ্গিক গ্রহণ করেননি। সুকুমারের গ্রন্থের জন্য সৃষ্টি হল হালকা হাসির প্রচ্ছদ। ও দিকে জীবনানন্দের কবিতার গ্রন্থে এক বিষাদময় স্পর্শের অনুভূতি আমরা লক্ষ্য করি। সত্যজিতের আঁকা বনলতা সেনের প্রতিকৃতি, বাংলার শিল্প-ইতিহাসে ক্লাসিক হয়ে আছে। সে দিক থেকে বাংলা গ্রন্থের প্রচ্ছদ বৈচিত্র ও স্টাইলের অভিনবত্বে সত্যজিৎ অদ্বিতীয়।

বাংলা বর্ণ / অক্ষর (alphabet) শিল্পে চমক ঃ

বাংলা বর্ণের মধ্যে যে অপরূপ রূপ লুকিয়ে আছে সত্যজিতের আগে কেউ তা, তেমন করে দেখাতে পারেননি। তিনিই প্রথম বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের গ্রন্থের মলাটে কাব্য উপযোগী, বর্ণের স্টাইল অংকন করেন। তাঁর হাতেই বাংলার বর্ণগুলি নবরূপ লাভ করে। ''সন্দেশ'' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি সন্দেশের পাতায় নতুন নতুন অক্ষরে, রূপে ''সন্দেশে''র ডালি সাজাতেন। কত বিচিত্র রূপে যে, সন্দেশ সৃষ্টি করা যায়,

সত্যজিৎ না থাকলে বোধ হয় আমরা কখনো জানতাম না। পুস্তকের মলাটে এই অক্ষর শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, শিশুরা বই পড়ার সময় অক্ষরের বিভিন্ন স্টাইলে ও মুদ্রায় ভারি আনন্দ পায়। পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পিসুততো দিদি নলিনী, মেট্রিকুলেশন পাশের পর বাবার কর্মস্থল বিহার থেকে, কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন। তিনি সে সময় বকুল বাগান রোডে মানিকের সোনামামার বাড়িতেও মাঝে মাঝে আসতেন। মানিকের বয়স যখন ১০/১২ বছর হবে। নলিনী দিদির কলেজের এক শিক্ষককে অবসরের মানপত্র দেওয়া হবে। তেমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে দিদি মানিককে সেই ভার দিয়েছিলেন। বাল্যকালেই তার হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। নলিনী দেবী লিখছেন — ''আমি ভেবেছিলাম, যে মানিক সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিষ্কার করে মানপত্র লিখে দেবে। কিন্তু সে শুরু করল রীতিমতন বাহারি হরফে লিখতে। যত বলি অত ভালো করার দরকার নেই, সাধারণ অক্ষরে লিখলেই চলবে কিন্তু মানিক তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে রীতিমত সৌখিন হরফে লিখতে শুরু করলো। স্বাভাবিকভাবেই অনেক সময় লেগে গেল। .... সমস্ত দুপুর কেটে গেল, বিকেল কেটে সন্ধ্যাও যায় যায়, তবুও লেখা শেষ হয় না। অবশেষে সমস্ত দিন একনাগাড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানিক যখন মানপত্র লেখার শেষ করল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।'' এ ঘটনায় কলেজের সকলেই ভেবেছিল কোন পেশাদার চিত্রকরকে দিয়ে এই মানপত্র লেখানো হয়েছে। বাংলা বর্ণকে নতুন রূপে সাজানোর আগ্রহ, নতুন মুদ্রায় আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার ইচ্ছা, শিল্পী সত্যজিতের হৃদয়ে বালক বয়সেই প্রোথিত ছিল।

বাংলা বর্ণ বিন্যাস বা টাইপোগ্রাফিকে তিনি করে তুলেছিলেন আধুনিক, মানানসই ও শিল্পসম্মত। সত্যজিতই প্রথম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলায় বর্ণবিন্যাসকে ব্যবহর করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মত ছিল — "one who holds typography, type design and calligraphy as among the most sophisticated of art form."

বিজ্ঞাপনের অভিনবত্বে ঃ

নব রূপে ও ভাবনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং বিজ্ঞাপনের সমস্ত বিভাগে মৌলিকতা সত্যজিতের নেতৃত্বে ঘটেছিল। পোস্টার হোর্ডিং, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞাপনেও নতুনত্ব এনেছিলেন শিল্পী সত্যজিৎ। পথের পাঁচালী পূর্ব বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''আধুনিক যুগে কেবল ছাপার অক্ষরে টাইপের সাহায্যে বিজ্ঞাপন পরিচালনা অচল। এই মধ্যযুগীয় আদর্শ থেকে বর্তমান বিজ্ঞাপন শিল্প মুক্ত হলেও আমাদের দেশে এখনো তার জের চলছে।'' ভারতীয় চলচ্চিত্রের পোস্টার সৃষ্টিতে তিনিই প্রথপ্রদর্শক। পথের পাঁচালীর পোস্টারে, মা-দিদির সঙ্গে দেখা গিয়েছিল অপুকেও।

রোমাঞ্চ-কাহিনীর পথপ্রদর্শক ঃ

ষাটের দশকের গোড়ায় তৃতীয়বার ''সন্দেশ'' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর সম্পাদক সত্যজিৎ, ছোটোদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু গল্প লিখেছেন। প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে কিছু সৃষ্টির ভাবনার ফসল আমরা দেখেছিলাম এবং বাদশাহী আংটি ফেলুদা কাহিনীর প্রথম গল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কার্যত সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের মূল অঙ্গটি পাশ করিয়ে, নিবিড় কুশলতায়, স্বচ্ছন্দে শিশু-কিশোর সাহিত্যের গগন স্পর্শ করেছিলেন। তিনি হয়তো ইচ্ছে করেই যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বাস্তবতা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মুগ্ধ কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে যেন এক চিত্তাকর্ষক, রোমহর্ষক ফ্যান্টাসির জগত সৃষ্টি করতে চেয়ে ছিলেন। আপাত ছোটদের জন্য লিখলেও, জনপ্রিয়তার নিরিখে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সত্যজিতের কলম-সুধা বাঙালি আজও আকণ্ঠ পান করে চলেছে।

লন্ডন যাত্রা ও সিনেমার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ঃ

বকুল বাগানে সোনামামার বাড়ি ছেড়ে ১৯৪৮ সাল নাগাদ সত্যজিৎ মাকে নিয়ে আলাদা বাসা বাড়িতে ওঠেন। ইতিমধ্যে মামাতো বোন বিজয়ার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা পরিবারের সকলেই জেনে গেছে। বিজয়ার সঙ্গে যে, তার চিন্তার বড়ই মিল, রুচির বড় সাদৃশ্য। এদেশে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের সম্পর্ক খোলা মনে মেনে নেওয়ার উদারতা আজও তেমন দেখা যায় না। সেদিক থেকে বিজয়া-সত্যজিৎ তাদের সম্পর্কের পরিণতির বিষয়ে একেবারেই

আশাবাদী নয়। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে মা সুপ্রভা দেবী, ছেলের ইচ্ছের বাদী হননি। একমাত্র ছেলের ইচ্ছেকে তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন। কত বড় হৃদয়, আর কতখানি আধুনিক হলে, আমাদের এই মন্থর সংস্কারগ্রস্থ সমাজে এই কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। সুকুমার জায়া সুপ্রভা সেটি করে দেখিয়েছেন। তিনি বিজয়া-সত্যজিতের বিবাহ দিয়েছিলেন। এমন জননীর গর্ভেই তো বিশ্বজয়ী পুত্র জন্মায়।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ। সত্যজিৎ বিজয়াকে নিয়ে লন্ডন গেলেন। বিদেশের যে সমস্ত কিংবদন্তি সিনেমা এদেশে দেখা সম্ভব হয়নি প্রাণভরে লন্ডনে সেগুলো দেখলেন। লন্ডনে পৌছেই সেইদিন সন্ধ্যায় ইতালিয়ান পরিচালক ভিট্টারিও ডি. সিকার ছবি "The bicycle thief" দেখে সত্যজিৎ অভিভূত। স্টুডিও ছাড়াই অপেশাদার অভিনেতা দিয়ে, বাস্তবের পটভূমিতে তৈরি এই ছবি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। (আমি নিজে ইউনিভারসিটিতে পড়বার সময়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'film study centre' নামে ভালো ছবি দেখার একটা কেন্দ্র ছিল। আমার এক সহৃদয় অধ্যাপকের বদান্যতায়''বাইসাইকেল থিফ'' সে সময় দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় ৩০ বছর আগের কথা বলছি। তখন ইচ্ছে করলেই এ সমস্ত ছবি দেখার কোনো সুযোগই আজকের মত ছিল না। সে ছবি দেখে, সেদিন আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম।) এরপর "miracle of Milan", "Manook of the north", "Luciano story" দেখে সত্যজিৎ আপ্লুত। এসময় সত্যজিৎ পাঁচ মাসে প্রায় ৯৯টি ছবি দেখেছিলেন। রাশিয়ান পরিচালক ডনস্কয়ের ছবি ''চাইল্ডহুড অফ ম্যাক্সিম গোর্কি'' দেখে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

''পথের পাঁচালী'' নিয়ে ছবি করবার জন্য ''দি বাইসাইকেল থিফ'' এর কাহিনী, টেকনিক ও অভিনয় তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল। দেশে ফিরেই তিনি পথের পাঁচালীর জন্য চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি করেন। এ সময়ে এক বিশুদ্ধ সার্বজনীন, শিল্পভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পথের পাঁচালী নির্মাণের ঐশ্বর্যে ঃ

সময়টা ১৯৫২ সাল। জীবনবীমা কোম্পানি থেকে ধার করা ৭০০০ টাকা, আর ১৬ মিলিমিটারের একটা ক্যামেরা নিয়ে শুরু হয়েছিল পথের পাঁচালী নির্মাণের অন্বেষণ। সঙ্গেদুজন বিশ্বস্ত টেকনিশিয়ান — বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর সুব্রত মিত্র। তাঁরা অবশ্য বলেছিলেন, এই সামান্য টাকায় ছবি নামবে না, অন্তত হাজার কুড়ি টাকা দরকার।

প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পীকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না, কারণ তাতে অনেক খরচা। সর্বজয়ার জন্য, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাছা হলো। তিনি শখের থিয়েটারে অভিনয় করেছেন মাত্র। সাধারণ স্কুলে পড়া একটি ছাত্রী, উমা দাশগুপ্তাকে দুর্গার ভূমিকায় নেওয়া হলো। ৮০ বছরের চুনিবালা ইন্দির ঠাকরুন। খানিকটা পেশাদার কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে হরিহরের জন্য বাছা হলো। অপুকে, কোথাও সত্যজিতের পছন্দ হচ্ছিল না। অবশেষে পাশের বাড়ির ছাদে ক্রীড়ারত এক বালককে বিজয়ার বড়ই পছন্দ হলো। সত্যজিৎ আর না করতে পারেননি। বালক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিন অপুর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল।

অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য সত্যজিৎ তখনও চাকরি ছাড়তে পারেননি। ছবির শুটিং চলছিল কেবল শনি-রবিবার। কিন্তু ক্যামেরার সবকটি শট্ আর এডিট করা হয়ে উঠছিল না। তবে ডি. জে. কীমারের একজন কর্মকর্তা ছবির খানিকটা অংশ দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যজিৎকে দীর্ঘ ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন এবং কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তাতেও কুলিয়ে উঠছিল না। টাকা-পয়সা প্রায় শেষ। স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে, দামি আর্টের বই বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হলো না। এখানেও মা সুপ্রভা দেবী রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকা নিলেন। তাঁর এক পরিচিত মহিলার সূত্রে, মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়কে ধরলেন। ছবির নির্মিত অংশটুকু দেখে মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছিল, ''পথের পাঁচালী'' বুঝি গ্রাম জীবনের উপর একটি ডকুমেন্টারি মাত্র। শেষ পর্যন্ত ১০০০০ টাকা সরকারি অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। পরে যখন পথের পাঁচালী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, ডাঃ রায় গর্ব করে বলতেন, ''দিস ইজ মাই ফিল্ম''। পরে তিনি সত্যজিতের একজন গুণমুগ্ধ দর্শক হয়ে উঠেছিলেন। (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে নিউইয়র্ক-এ শিল্প প্রদর্শনীর ব্যাপারে ''মর্ডান আর্ট'', বিভাগের একজন কর্মকর্তা মনরো হুইলার আগেরবছর কলকাতায় এসেছিলেন। পথের পাঁচালীর খণ্ডিত সংক্ষিপ্ত কাজ দেখে, তিনি আনন্দিত হয়ে সত্যজিৎকে প্রদর্শনীর আগেই ছবিটি শেষ করতে অনুরোধ করেন। ইউনিটের সকলে খাওয়া-ঘুম বন্ধ করে শেষ পর্যন্ত সময়ের আগে ছবির কাজ শেষ করা গিয়েছিল)।

বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় পথের পাঁচালী মুক্তি পেয়িছিল। প্রচলিত ধাঁচের সিনেমায় অভ্যস্ত কলকাতার দর্শক সেদিন বসুশ্রী হলের চেয়ার ভাঙ্গার জোগাড় করেছিল। সত্যজিৎকে তখন কেউ চেনেনা, তাই রক্ষে। তিনি হলের বাইরে দর্শকদের অভিমত নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

তবে সপ্তাহ দুয়েক পরেই চিত্রটা পাল্টে গেল। মুখে মুখে রটে গেল ছবির অসাধারণত্বের কথা। সেই বসুশ্রী হলেই ''পথের পাঁচালী'' ছয় সপ্তাহ চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবির প্রযোজক হিসেবে স্বত্ব কিনে নিয়েছিল। ছবি তৈরিতে গভারমেন্ট যে টাকা খরচ করেছিল, তার থেকে অনেক গুন বেশি ফেরত পেয়েছিল। এরপর বাকিটা ইতিহাস।

সত্যজিতের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ঃ

এসময় ''পথের পাঁচালী'' নিউইয়র্কে দেখাবার ভার নিয়েছিলেন এডোয়ার্ড হ্যারিসন। তিনি পরবর্তীকালে সত্যজিতের সব ছবি মার্কিন মূলুকে দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। বারংবার আমেরিকা থেকে কলকাতায় ছুটে ছুটে আসতেন। "New York Times Magazine" এ একজন সমালোচক লিখেছিলেন — one of the most beautiful and sensitive pictures I have ever seen. পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে সমালোচক রবার্ট স্টিল লিখছেন — ''আমাদের দেশের অশিক্ষিত মূর্খ সমালোচকরা বলেছিলেন, ছবিগুলি বড় ধীর গতির একঘেয়ে এবং বিরক্ত জনক। এঁরা মুখ লুকোবার জায়গা পাননি। যখন দেখা দেল নিউইয়র্ক শহরে পথের পাঁচালী দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলল। পরিচালক রবার্ট হকিংস লিখছেন — "Apur Sansar" has proved that Ray is one of the best directors in the post world-war. This flim is a picture of world humanity and beauty."

পুরস্কার ও সম্মান প্রসঙ্গে ঃ

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর, বর্ণময় কর্মজীবনে সত্যজিৎ শতাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং বাঙালি তথা দেশবাসীকে গর্বিত করেছেন। দেশ-বিদেশে তাঁর সেই সমস্ত সম্মান-পুরস্কারের আলোচনা, এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবু কিছু কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

''পথের পাঁচালী'' আত্মপ্রকাশের পর ঃ

১৯৫৫ সালে ''পথের পাঁচালী'' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিকতাবোধের ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

ওই বছর, এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবে diploma of merit সম্মান পায়।

১৯৫৬ ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে Golden carbao award লাভ করে।

১৯৫৮ সালে কানাডা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার পায়।

১৯৫৯ সালে নিউইয়ার্কে প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির পুরস্কার লাভ করে।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে টোকিওতে শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির পুরস্কার লাভ করে।

অপরাজিত

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি Golden lion of Saint Mark পুরস্কার লাভ করে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার।

অপুর সংসার

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এ ছবি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায়।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের 'লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে' বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়।

ওই বছরই এডিনবরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে diploma of Merit লাভ করে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের National board of review of motion pictures দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির সম্মান পায়।

চারুলতা

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের টোকিও চলচ্চিত্র উৎসবে মেরিট অ্যাওয়ার্ড।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি।

সীমাবদ্ধ

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ।

অশনি সংকেত

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

শতরঞ্জ কি খিলাড়ি

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।

জয় বাবা ফেলুনাথ

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পুরস্কার

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সাইপ্রাস চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কার।

এছাড়াও সত্যজিৎ অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। দেশ ও দেশের বাইরের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। পেয়েছেন ''দাদাসাহেব ফালকে'' অ্যাওয়ার্ড, বিশ্বভারতীর ''দেশিকোত্তম''।

ভারতরত্ন সত্যজিৎ ঃ

১৯৯২, ২০ মার্চ সত্যজিৎ হলেন ভারতরত্ন। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে, ওইদিনই তাকে ভারতরত্ন দেবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে ভারতরত্নের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রথা ভেঙে ''অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য কর্তব্য সাধনের'' জন্য দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ''ভারতরত্ন'' সত্যজিৎকে অর্পণ করা হয়। অসাধারণ, অনন্য ব্যতিক্রমী সত্যজিৎ।

প্রসঙ্গ অস্কার ঃ

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তামাম ভারতের মিডিয়া জানিয়েছে, এবছর সত্যজিৎ তার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য বিশ্বের সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার ''অস্কারের'' জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার অন্তত ৭০ জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ''অস্কার কমিটি'' কে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সত্যজিতের পক্ষে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন — জগৎ বিখ্যাত পরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ, ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা, পল নিউম্যান, জর্জ লুকাস, ইসমাইন মার্চেন্ট এবং জাপানের অস্কারজয়ী পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া।

১৯৯২ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাস। অসুস্থ সত্যজিৎ। রয়েছেন বেলভিউ নার্সিংহোমের কেবিনে। তার আগেই অস্কারপ্রাপ্তির খবর তার পরিবার পেয়েছিল। পুত্রবধূ ললিতা তাঁকে একটি সারপ্রাইজ দিতে চান। তিনি একটি কাচের বাটিতে অনেকগুলি ভাঁজ করা কাগজ রেখে, তার থেকে বাবাকে একটি তুলে নিতে বললেন। সত্যজিৎ খুলে দেখেন তাতে লেখা অস্কার। মুগ্ধ, অভিভূত, আপ্লুত সত্যজিৎ। মুহূর্তে সব অসুস্থতা যেন কেটে গেল। তিনি বলে উঠলেন আমি আবার ছবি করব। সেই পাত্রের সবকটি কাগজে যে অস্কার লেখা ছিল, তা বুঝতে সত্যজিতের মোটেই অসুবিধা হয়নি, তবু তার শিশুমন, তা থেকে নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছিল।

১৯৯২ এর ১৬ মার্চ, হলিউডের জনপ্রিয় প্রোডিউসার আল শেয়ার্জ, বেলভিউ নার্সিংহোমে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সত্যজিতের হাতে ''অস্কার স্মারক'' ''গোল্ডেন মূর্তি'' তুলে দেন।

ফরাসি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ঃ

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স থেকে এল এক আমন্ত্রণ পত্র, সত্যজিতের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ''লিজিয়ন অব অনার'' গ্রহণের জন্য ফ্রান্সে

যাওয়ার আমন্ত্রণ পত্র। তিনি তখন বেশ অসুস্থ। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁর অবস্থার কথা ফরাসি গর্ভারমেন্টকে চিঠি লিখে জানান। তারপর আর এক ইতিহাস। কোন রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে নয় — ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ কলকাতায় আসছেন সত্যজিৎকে পুরস্কৃত করতে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ফরাসি দূতাবাস তাঁদের গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল। তবে সত্যজিৎ ঠাকুরদার নকশাদার কাশ্মীরি শাল কাঁধে চাপিয়ে বাঙালির নিজস্ব পোশাক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই, নিজের গাড়িতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সত্যজিতের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ বলেছিলেন —

"Expressing modern India with the sensitivity of the great poet."

সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে বাঙালি তথা ভারতবাসীর নিকট সৃষ্টি হয়েছিল এক গৌরবময় মুহূর্ত।

তাঁর সৃষ্টি আজও বিশ্বে বড় প্রাসঙ্গিক ঃ

২০১৫ সালের মে মাস। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার — নতুন করে আমেরিকায় বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেল অপু ট্রিলজি। নিউইয়র্ক শহর। নানা ভাষা, নানা জাতির নর নারী কিশোর-কিশোরীতে প্রেক্ষাগৃহ ভরাট। হল থেকে জলভরা চোখে বেরিয়ে আসছেন দর্শক। এরপর আমেরিকার প্রধান শহরগুলোতে এবং কানাডাতেও নতুন করে ''অপু ট্রিলজি'' মুক্তি পেয়েছিল। ১৯৫৫ সালে আমেরিকা আরেকবার দেখেছিল এই দৃশ্য। এবারের প্রদর্শনীতে স্রষ্টানন — উপস্থিত ছিলেন পুত্র সন্দীপ, আর পুত্রবধূ ললিতা। অভিভূত হয়েছিলেন তাঁরাও। আজকের গ্লোবাল দর্শকের নিকটে ''পথের পাঁচালী'' সমান আবেদনে ভাস্বর। তাঁর সৃষ্টি ভেঙে ফেলে, দেশ কাল জাতি-ধর্মের বেড়াজাল।

সময়ের তালে তালে যেন সত্যজিৎ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। ২০১৫, জুন মাস। নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরে এক ব্যতিক্রমী ইতিহাসের সাক্ষী রইল বিশ্ববাসী। সমগ্র বিশ্ব থেকে মাত্র ১৬ জনকে এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত করা হয়েছিল। যাঁরা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববাসীকে বারংবার স্মরণ করিয়েছেন — ''আমাদের মানবিক গুণগুলি আমাদের চেতনায়, আমাদের কাজে লালন-পালন করা সভ্যতার জন্য কত প্রয়োজনীয়। আর মানব সভ্যতা যে প্রকৃতির উপর কতখানি নির্ভর — সেকথাও স্মরণ করিয়েছেন।'' এই অনুষ্ঠানের আয়োজকরা হয়তো মানুষের চিরকালীন দুর্লঙ্ঘ্য মানবিক আবেদনকেই মান্যতা দিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের ১৬ জন বাছাই করা ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ছিলেন অন্যতম।

আরো দুটো কথা ঃ

গত দেড় শতাব্দী ধরে ঠাকুর বাড়ি ও রায় বাড়ি, বাঙালি তথা ভারতবাসীকে তাদের সৃষ্টির প্রসাদগুণে (ব্রহ্মস্বাদ) আচ্ছন্ন রেখেছেন। এমনকি এই দুই পরিবারের শ্রেষ্ঠ দুই রত্ন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের সৃষ্টিতে বিশ্ববাসীও বিমোহিত। বাঙালির আজকের যে মানবিক আধুনিকতা, বাঙালির আজকের যে নান্দনিক মর্যাদা, তা তো ঠাকুরবাড়ির; আর অবশ্যই অনেকটা রায় পরিবারের। এই দুই পরিবার যতই উপরে উঠুক মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের বন্ধন কখনো ছিন্ন হয়নি। তাইতো মানুষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রাণ পেয়েছে। সত্যজিতের সৃষ্টিতে আপ্লুত হয়েছে। দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর থেকে সত্যজিৎ — উত্তরাধিকারের এই বহমানতা আজও সমানতালে চলছে। আজকের আধুনিক বাঙ্গালী জাতিই তো এই দুই পরিবারের উত্তরাধিকার। এই দুই পরিবারের পুরুষেরা স্বশিক্ষিত। তারাই বাংলা তথা ভারতের সমগ্র মনোজগতে ও সংস্কৃতি জগতে নতুন ভাবনা ও দর্শনের স্রষ্টা। শতাব্দীকাল ধরে বাঙালি সেই মনন, সেই দর্শন, সেই আধুনিকতার বাহক। আজকের সমগ্র বাঙালি জাতিই তো রবীন্দ্রনাথ সত্যজিতের সার্থক উত্তরাধিকার বহন করবার জন্য সর্বদা সজাগ, চিরব্যপ্ত, ব্যাকুল!

WE

Taraknath Chanda, Assistant Teacher
(Secretary, Staff Council)

"Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to have little hopes; it is rather hardwork, there is now no smooth road into the future; but we go round, or scramble over the obstacles. We've got to live, no matter how many skies have fallen." At the beginning of the third decade of the third millennium our conviction voices absolutely with D.H. Lawrence.

In the history of human civilization 'School' is the second oldest social organization after 'Family'. It is not a brick and morter structure but a spiritual edifice-emiting ethereal energy and life itself. We all take pride in placing ourselves in the centre of 'Life'.

Chakdaha Ramlal Academy stands with hallowed height and hoary tradition. The visionary endeavours and the missionary zeal of our forebearers have paved the genuine ground where we garden today. Green garden grins. All the tireless strivings stretched to found Chakdaha Ramlal Academy in 1907 and the subsequent flow of life and energy have made our today. Salute to those great souls.

Yesterdays make to-day we foster; we nurture human child on sacred soil of humanity. The task is simple but not easy.

Methods are there; mechanism operates-children grow into human beings, not into 'Robots'. We have to put our hearts like a nucleus. Every heart punches out blood; we have to feel. Teachers, to me, are feelers. They act and react accordingly. Our teachers pour all the softer emotions and infuse values in the learners-ready to take on the greater World. More often than not our students top the academic merit list. Our eyes shine on the reflected light of success. Our boys and girls rush with oxyzen cylinders to save a covid patient from the Jaws of death. Our hearts beat better. Both touch us tellingly.

Covid-19, Lockdown, Mask, Social distancing, Sanitizer. With these horrible words India locked herself down on the evening of 24th March, 2020. 1.38 Billion people went indoors.

Uncertainities became the certainties of life. Unkown invisible enemy created unkown fears. The surge of Corona Virus has swept us both physicially and psychologically. The bizarre sights of Covid patients gave a clarion call to humanity. Amidst tears, rage, anguish, bitterness and desperation the health workers battled boldly-succeeded or failed. He did not retreat or escape. The battle is on. We pay our greatest tribute to all of them. The scientista and researchers strained their nerves and came

out with life-guarding vaccine. We bow our heads to their unwearied effots. The Academy congratulates all the Covid warriors putting a brave fights in different fronts.

Our Head Master Dr. Ripan Paul, a versatile genius, assumed the office only in the last year. But he took no time to set the institution on the track of accelerating progress. He does possess a heart of resolution, head of innovation and heands of execution. His concerns for the betterment of the school, students and ambience will provide the Academy more dividends. Dodging the fatal frowns of Covid he has shown how to head a school and how to lead all from darkness to light. Instead of shelving the talents of the learners he helps them to showcase their originality to the greater arena of education. These barrier-breaking efforts will bear golden fruits.

Our Assistant Head-master Sree Somenath Mozumder, an erudite personality, has had the vast experience of heading and leading school for years. As an assistant head master he does not restrict himself only in playing the second fiddle. His sagacity and sincerity remain to be invaluable asset for the school.

Our Managing Committee — The School managing committee headed by the honourable President Sree Anjay Kr. Sasmal has been playing a positive role. Their eagle eyes and sensitive souls have been guarding and guiding the school towards desired direction. Our teacher-representatives Sree Pradip Kr. Sarkar, Sree Paritosh Ukil and Sree Rajesh Kr. Chatterjee have been playing crucial roles to the envious uncertain hours of Covid. Pradip babu and Rajesh babu have been rendering relentless service to the school. Sree Sunil Kr. Sarkar, honourable member of MC (Non TR) has been working admirably. With out belittling anyone or any effort, I appreciate the ceaseless strivings of Sree Rajesh Kr. Chatterjee for the last decade. In fact this young, amiable and energetic teacher is the treasure of our school.

Our Academic Council we have a council of teachers elected by our staff. Sree Saifuddin Mollah, Sree Ashis Baidya and Smt. Paromita Paul are the honourable members. Our Assistant Headmaster is the Secretary of the council and the overall supervision is done by our honourable Headmaster. It is the most important part of a school. It operates like an orchestra through out the year in sun and shower. The council has the honesty and courage to let the students review their answer scripts even in the annual examination. They are laborious, responsible and active even in this pandemic hours.

Our Library — The Academy takes pride in the Library with huge collection of books. Century old books are shelved providing magnetic air. The school is looking after a reading room in an urgent basis. Books needed to arm the aspiring students to compete and conquer are served in the library. We thank Sree Ashis Baidya for discharging his additional duty as a Librarian.

Our office — Our Academy does have effective, skilled and industrious staff for the office. Sree Sunil Kr. Sarkar, Sree Suvayan Dey, Smt. Priyanka Adhikary are doing excellent works. Sree Kallol Paul Chowdhury, Sree Subhra Prokash Sinha Roy and Sree Sankar Chatterjee are always dynamic to carry out the office work smoothly. Sree Samit Mondal and Sayantan Biswas have been assisting the school admirably during these horrible hours. Sree Shyamal Sen is a silent worker in the school.

Sports — We do have a spacious ground and sports complex with indoor games facilities and swimming pool. Respected teachers Sree Ujjwal Kr. Utthasani and Sree Nisith Mondal supervise all the activities with rare skill. The ground calls for an upgradation and it is being looked after. But all these wait for the students spending impatient hours at home.

Mid-day Meal — It will be sin for me unless I mention the risky job of distributing the food items at this pandemic situation. This recurrent work has been efficiently done by a group of women. They are ever ready. We are proud of them, too. Sree Rajesh Kr. Chatterjee here also takes the lead.

Our Staff — All the members of the Staff council are friendly and humane. In an absolute democratic air all breathe freely and exchange their voices. Essential needs are taken care of. Thus our diligent, punctual and responsible members face the class and impart quality education among the learners. We may debate : We may differ but Chakdaha Ramlal Academy matters the most for all of us. We stand together – we sing together – melt into a unified soul. This has been in the DNA of our Academy. Let us preserve it.

CLTP programme has been continuing gloriously in our school under the guidance of Sree Sudipto Dey.

Vocational educaiton with different courses is going on smoothly in the school with the active guidance of different faculties.

On the fertile soil of faith and fervour our visionary Headmaster took up a host of Academic programmes not only to impart education of the students but also to break the boredom of them under the reign of Covid. Participation of the teachers, students and parents broke the virtual barrier. Among these the printing media and the electronic media highlighted the 'Abul. K. Yan' on 31/12/2020. 'Scientific Names' (For Class XII) on 07/07/2021 and Chromosoms (For Class X) on 17/07/2021.

Some of the webinars organised during the Covid pandemic, are 'Short out Techniques of Mathematics on 29/11/2020, Common errors in Mathematics on 07/02/2021, 'Enhancing study skill to secure success', 'Service book and related issues on 23/05/2021. 'Code of conduct for Schools' on 06/06/2021 'Mind and Corona – taking care of mental health' have also been organised. These state, national and international lavel activities have had much impact on the students, teachers and the community concerned.

Dr. Partha Karmakar, the honourable Deputy Secretary (Academic), WBBSE supervised or sponsored all the programmes quite successfully. The school expresses its humble gratitude to this magnanimous soul.

International Women's Day was observed. Mask distribution among commoners was done and road safety week was also observed by the NSS unit of the school. Awareness regarding second wave of Corona Virus and the role of NSS volunteers in WB was discussed On 27/04/2021. NSS prog. Co-ordinator Astapada Mandal and Regional Directorate Mr. Vinoy Kumar opened new avenues on the topic. On 5th June 2021 we observed World Environment Day with a seminar on "Yesterday, Today, Tomorrow; Looking back – Living esent and Hoping Future". Dr. Partha Karmakar, Dr. Pinaki Ranjan Roy, Dr. Vinod Kr. Das, Dr. Bivas Guha, Dr. Krishnendu Mandal enriched the programmes with their vast experience and visionary zeals. International Plastic Bag Free Day was observed on 03/07/2021. Dr. Sudipta Bhattcharya, analyst and researcher, presented his vital views. Honourable A.I. of Schools (S.E. Kalyani Sub-division) Mr. Mehebub Asif Zaman voiced his concerns and showed the road map to have a plastic bag free world.

The International Webinar on 'Psychological Paradigms of school going in Covid 19 era' was held on 04/07/2021. Honourable Professor at Chicago University, USA, Mr. Dulal Kr. Bhowmik placed his invaluable views on it. Honorable All of Schools also graced the discussion greatly. All these programmes aimed at dredging the silting minds of students, teachers and concerned communities during the pandemic. I must mention the name of Sree Tushar Kanti Pal, Our Assistant Teacher and advisor of NSS (WBCHSE) for being instrumental of supervising many a programmes during this Covid era.

Last but not the least, the school observed the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, Rabindra Jayanti, International Yoga Divas with due fervour. Related videos were published. But the physical absence of the studnents has reduced the colours and grandeur of these programmes.

Little written; unwritten vast. A person may come; A person may go. But our Academy will continue to march-march with the torch of light and education. Any endeavour from any corner to enrich the school has always been appreciated. We are ready to burn ourselves like candles and incense sticks. Let the sedate rays of life and light touch all; let the fragrance of humanity permeate all.

প্রধান শিক্ষকের লেখনীতে —

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায় ছাত্র জীবনের কথা। মনে পড়ে যায় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়দের কথা। অনেকে জীবিত আছেন, আবার অনেকে আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাদের পাঠদানের পাশাপাশি নীতিকথা, মূল্যবোধের শিক্ষা ও অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসায় আজও তাদের মুখগুলো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে বন্ধুদের কথা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারা। কখনো দেখা হয়, কখনও ফোনে আলাপ হয়। মনে পড়ে বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন দিনের কথা। কোন একদিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস শেষ হতেই এমন মনে হল সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো। ইতিমধ্যে বিদ্যালয় এর পাশে জমা জলে মত্ত দাদুরির গোঙানি। তারপর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম বলাকা শ্রেণীর ডানায় ভর করে সেই দিনের শেষ লাল আভাটুকু কোথায় যেন স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। এখন আর ব্যাঙ প্রায় চোখেই পড়ে না, এত বিল্ডিং উঠেছে যে বিদ্যালয়কে চেনাই যায় না। আগের ছবিটা একেবারেই পাল্টে গেছে। তবু যেন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কোথা থেকে একরাশ ভক্তি নেমে আসে। মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত সুবল চন্দ্র মণ্ডল স্যারের কথা, শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার মহাশয় এর কথা, শ্রী শ্যামল ব্যানার্জি স্যারের কথা, প্রয়াত অজিত পান্ডে স্যারের কথা, শ্রী অশোক মুখার্জী স্যারের কথা। অন্যান্য স্যার ও বিশেষ করে এদের সহযোগিতা ছাড়া আজ হয়তো জীবনের এই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব হতো না। তাদের কাছে পেয়েছি অনেক। বিদ্যালয়কে তথা সমাজকে কতটা দিতে পারছি বা পারব প্রশ্ন জাগে।

বিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে বলার কিছু নেই। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার মহাশয় রচিত 'চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমি - পট ও পটভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থে পূজনীয় স্যার সুনিপুণভাবে বিদ্যালয়কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পৌঁছে দিয়েছেন আধুনিকতার আলোকে। সত্যি এক কথায় বলতে হয় — এটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। তদানীন্তন সময়ের চাকদহ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে আগ্রহী গুণীজনসহ চাকদহ ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের ফলে ১লা আগস্ট ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এক অনাড়ম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চাকদহের প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় বেনীমাধব ইনস্টিটিউট পরবর্তীকালে চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমি জন্ম নেয়। এই ১লা আগস্ট ১৯০৭ সময় থেকে বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে আসছে।

প্রায় দেড় বছরের কাছাকাছি সময় আমরা করোনা স্বাস্থ্যবিধির সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে চলছি। বিদ্যালয়ে চলছে নিয়মিত অনলাইন শ্রেণী পঠন-পাঠন। সেই সঙ্গে পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা অনলাইনে করে সেগুলো ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে তাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রকম ওয়েবিনারের ব্যবস্থা করে চলেছি। সেখানে অভিভাবক অভিভাবিকা শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের সামিল করে খানিকটা সময় তারা যাতে একঘেয়েমি থেকে একটু অন্য ভাবে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে তার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ভিন্ন আমাদের বিকল্প কোন পথ ছিল না। এর মধ্যেও বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য আমরা পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও পিছপা হইনি। বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি বড় পাওনা। বিদ্যালয় পত্রিকা হল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনার দর্পণ। বিদ্যালয় পত্রিকা কমিটিসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল — বিদ্যালয়ের পক্ষ

থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আধিকারিকবৃন্দ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল মহাশয় এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দ যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে বিদ্যালয়ের জন্য কিছু লিখে পাঠিয়েছেন। করণা মহামারীর মধ্যেও এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকাটি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপহার দিতে পেরে আমরা খুশি। সবথেকে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে দেশে আজ মানুষের বড় অভাব। চেষ্টা করি ভালো মানুষ হওয়ার জন্য। মানুষ হওয়ার চেষ্টা আজীবনের তপস্যা। ভুল হয়, ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা করি। প্রতি পদক্ষেপে যে শব্দগুলোর অভাব বোধ হয় তা হল আত্মবিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা, নিঃস্বার্থপরতা, দেশপ্রেম, হৃদয়বত্তার বিকাশ, সময়ানুবর্তিতা, পরোপকার, কর্তব্যনিষ্ঠা, সংযম, সত্যবাদিতা, অবিচলতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা, মনঃসংযোগ, নির্ভীকতা ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্র গঠন নিয়ে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, ***"First make character — that is the highest duty you can perform."*** তাই চরিত্রই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার। স্বামী বিবেকানন্দ আরো বলেছেন, ***"Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning; it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties. Be clear this in mind."*** ছাত্রদের চরিত্রের উপর জাতীয় চরিত্র নির্ভরশীল। তাই এই চরিত্র গঠনের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ নজর দিতে হবে। লেখাপড়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিনয়, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি সৎ গুণের অধিকারী হতে হবে। সুন্দর চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, ***"Character is repeated habits, and repeated habits alone can reform character."*** তাই ভালোবেসে পড়াশোনা করো, আর ভালোবেসেই এই গুণগুলো নিয়মিত অনুশীলন করো, তাহলে ভালো ছাত্র-ছাত্রী হয়ে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষ হয়েও গড়ে উঠবে।

আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিছু দায়িত্ব পালন করি এ কথা ঠিক। এ বিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে একসময় এসেছিলাম, শুধু চাকরি শেষ নয় আজীবন আমি এই বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে থেকে যেতে চাই — এই ভাবনাকে মনে একটা বড় প্রশান্তি জাগে। আমি যেন ভালো মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি। এর সঙ্গে বিদ্যালয় তথা সমাজের কিছু কাজ যাতে করতে পারি — এই দেব মন্দিরে বসে এই আমার প্রার্থনা — তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দৃঢ়তার সঙ্গে বলি আমি তোমাদের মতই একজন।

ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো আগামী দিনে তোমরা ভালো মানুষ হয়ে ওঠো। আর মানুষ হওয়ার জন্য যে মনীষীর জীবনীকে সবচাইতে বেশি পাঠ করতে হয়, স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন করতে হবে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইদানিংকালে তো আছেই, তদানীন্তন সময়ও কত বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর একটা বাণী নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে গেলে তার সারাটা জীবন কেটে যায়, এইটি যে আমৃত্যু কালের তপস্যা। এস, আমরা চরিত্রবান, নিঃস্বার্থপর, দেশপ্রেমিক, আত্মবিশ্বাসী, হৃদয়বান মানুষ হয়ে উঠি সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, আহ্বান জানাই নতুন সৃষ্টিকে, আর কবি অতুল প্রসাদ সেনের সেই কথাগুলি স্মরণ করি,

‘‘বল বল বল সবে
শত বীণা বেনু রবে,
ভারত আবার জগত সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।’’

জাতীয় সেবা প্রকল্প — প্রতিবেদন

তুষার কান্তি পাল, শিক্ষক
(স্টেট মেম্বার এন.এস.এস. অ্যাডভাইসারী কমিটি, প.ব.উ.শিক্ষা সংসদ)

আমাদের বিদ্যালয়ের NSS Unit-টি শুরু ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে, এই সময়কালেই ভারতবর্ষে বিদ্যালয়স্তরে NSS প্রবর্তন হয়। উচ্চমাধ্যমিকস্তরের একশত (১০০) ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠিত হয় Unit-টি। সারাবৎসর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে Volunteer-রা নিজেদেরকে সক্রিয় রাখে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করে। নিম্নে কয়েকটি কর্মসূচীর উল্লেখ করলাম ঃ

1. সরস্বতী পুজোর আপ্যায়নে NSS Volunteer-রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
2. Dhubulia Shyamaprosad Shikshayatan (H.S.), Nadia-তে অনুষ্ঠিত "Drug Abuse Prevention & Counseling" বিষয়ক রাজ্যস্তরের কর্মসচীতে বিদ্যালয়ের দশজন (১০) NSS Volunteer যোগ দেয় এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে গত ১০.০২.২০২০ তারিখে। ভারত সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র অর্জন করে।
3. Covid-19 অতিমারী শুরু হয়। তাতেও NSS Unit-এর সচলতা বন্ধ হয়নি। গত ২৫.০৪.২০২০ তারিখে JIS Engineering College, Kalyani এক Webniar-এর আয়োজন করে। Webniar বিষয়গুলি ছিল Role of NSS Volunteer during Covid-19. এই Webniar-র প্রধান বক্তা ছিলেন NSS Unit-এর Programme Officer, বিদ্যালয়ের NSS Volunteer-রাও অংশগ্রহণ করে।
4. দত্তক গ্রামেNSS-এর প্রাক্তন Volunteer-দের সাহায্যে Covid-19 সম্পর্কে সচেতনতার কর্মসূচী নেওয়া হয়। NGO-দের সহায়তায় দত্তক গ্রামে বসবাসকারী NSS Volunteer-রা (প্রাক্তন ও বর্তমান) প্রয়োজনীয় সামগ্রি প্রদান করে।
5. কল্যাণী বইমেলা ২০২০ কমিটি চাকদহ রামলাল একাডেমীর NSS Unit-কে সম্বর্ধনা দেন ১৪/১২/২০২০ তারিখে এবং NSS Unit-এর দত্তক গ্রামের পড়ুয়াদের জন্য খাতা ও কলম উপহারস্বরূপ প্রদান করেন বিদ্যালয়ের NSS Unit-এর Chairman ড. রিপন পাল মহাশয় এবং উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য তিনজন শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার, শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী ও শ্রী পরিতোষ উকিল।
6. ১৯/১২/২০২০ তারিখে চাকদহ রামলাল একাডেমীর NSS Unit-এর উদ্যোগে যশড়া আদিবাসী পাড়ায় (দত্তক গ্রাম) কল্যাণী বইমেলা কমিটি থেকে প্রাপ্ত খাতা-কলম, চাকদহ রামলাল একাডেমী প্রাক্তনী সমিতি থেকে প্রাপ্ত Mask এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী চন্দন চক্রবর্তী মহাশয় প্রদত্ত ফুটবল প্রদান করা হয় পড়ুয়াদের মধ্যে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ড. পার্থ কর্মকার, উপসচিব (শিক্ষা), পঃবঃ মঃ শিঃ পর্ষদ, মাননীয় শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল, সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার ও শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী সহ আরো অনেক শিক্ষক এবং বিশিষ্টজনরা। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল মহাশয়।
7. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'State Level Celebration On National Integration হয় ২৮.০১.২০২১ তারিখে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। একমাত্র বিদ্যালয় চাকদহ রামলাল একাডেমী সেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এবং আমাদের Volunteer Shrestha Banerjee বিবেকানন্দ ও জাতীয় সংহতির উপর ইংরাজীতে বক্তব্য

পেশ করে যা উপস্থিত সকল অতিথিদের প্রশংসা অর্জন করে।

8. রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে 'বিবেক চেতনা উৎসব - ২০২১' পালিত হয়েছে ১২/০১/২০২১ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে। পদ যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবকরা যোগ দিয়েছিল। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল যেমন বসে আঁকো, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল আলোচনা সভার মূল বক্তব্য পেশ করেন এবং স্বামীজির জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন।

9. ১৭-ই ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে অনুষ্ঠিত হয় "Road Sefety Week" বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন থেকে এক সচেতনতামূলক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ও বর্তমান প্রায় দুইশত NSS Volunteer-রা যোগ দেয়। পদযাত্রার শেষে বিদ্যালয়ের মুক্তধারা মঞ্চে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি NSS Them Song-এর মাধ্যমে শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী দীপক বসু, সহকারী সভাধিপতি, নদীয়া জিলা পরিষদ, মাননীয় শ্রী অগ্নিমিল দাস, Youth Officer, Regional Directorate of NSS, Kolkata, Govt. of India. মাননীয় অধ্যাপক স্বপন গুপ্ত, শ্রী অঞ্জয় শাসমল, সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এছাড়াও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির মাননীয় সদস্যগণ এবং আরো সম্মানীয় শিক্ষক মহাশয়গণ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক। সমগ্র অনুষ্ঠান দুটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক শ্রী দেবকুমার মণ্ডল ও শ্রী সাধন মণ্ডল। সফল ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রদান করা হলো ভারত সরকার প্রদত্ত "Swachh Bharat Summer Internship - 2019 শংসাপত্র। ভারত সরকারের সচিব পর্যায়ের দুইজন অফিসার তাতে স্বাক্ষর করেন।

10. ৮ই মার্চ, ২০২১ অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বক্তব্য রাখেন ড. রিপন পাল, শ্রী সাধন মণ্ডল ও শ্রীমতী প্রিয়ঙ্কা অধিকারী।

11. চাকদহ রামলাল একাডেমী ও রিজিওনাল ডিরেক্টরেট অফ এন.এস.এস., কোলকাতা এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ও জনসাধারণ এর উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার হয় ভার্চুয়াল মঞ্চে। বিষয় ছিল ঃ Webinar on awarness regarding second wave of Corona Virus & Role of N.S.S. Volunteers in West Bengal. এই Webinar প্রদর্শিত হয় বিদ্যালয়ের Youtube link F.B. Link এবং Google Meet এর মাধ্যমে। সারা ভারতবর্ষের প্রায় 1500 জন অংশগ্রহণকারী এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই Webinar-এ স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল, NSS স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে এই Webinar-এর লক্ষ্য ও কর্মধারা নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক তুষার কান্তি পাল, স্টেট মেম্বার, এন.এস.এস., অ্যাডভাইসারী কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উপস্থিত ছিলেন শ্রী অষ্টপদ মণ্ডল, প্রোগ্রাম কো-অরর্ডিনেটর এন.এস.এস. এবং ডেপুটি সেক্রেটারী (অ্যাডমিন), পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, সেকেন্ড ওয়েভ অফ করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করেন ড. সুপম মুখার্জী, এন.এস.এস. নোডাল অফিসার, মুর্শিদাবাদ, ড. পার্থ কর্মকার, ডেপুটি সেক্রেটারী (অ্যাকাডেমিক) মাধ্যমিক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আলোচনা করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের করোনা অতিমারিতে ভূমিকা এছাড়া করোনা টীকাকরণ ভীতি এড়ানোর জন্য আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন মি. ভিনয় কুমার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, এন.এস.এস, কলকাতা, Government of India. এরপর আলোচনা করেন ড. সৈকত বিশ্বাস, কমানডেন্ট (মেডিক্যাল), সি.আর.পি.এফ., ভারত সরকার, এছাড়া সমাপ্তি ভাষণ দেন শ্রী অগ্নীনিল দাস, জাতীয় যুব আধিকারিক, রিজিওনাল ডিরেক্টরেট অফ এনএসএস, কলকাতা।